KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ১৪৮ নং রসা রোড (সাউথ) কালীঘাট, কলিকাতা ২০৮/২১বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher রমেশচন্দ্র চৌধুরী
Title নারায়ণ	Size 5.5"×9.5" 13.97×24.13 c.m.
Vol. & Number ১/১-৩ ১/৫	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩২১ – মাঘ, ১৩২১ চৈত্র, ১৩২১
	Condition : Brittle ✓ Good
Editor : চিত্তরঞ্জন দাশ	Remarks : No. of Pages Missing

CD. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

নারায়ণ

চৈত্র
সন ১৩২১।

সম্পাদক-
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

বিজ্ঞাপনাদি—নারায়ণে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার নিয়মাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকটে চিঠি লিখিলে বা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া কথা কহিলেই জানিতে পারা যাইবে।

প্রবন্ধাদি—নারায়ণে কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন, আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন।

নারায়ণ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। এজন্য লেখকগণ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

চিঠিপত্র—সম্পাদকের নামীয় পত্রাদি ও নারায়ণে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে—১৪৮নং রসারোড, (সাউথ) কালীঘাট কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

চাঁদার টাকা ও অন্যান্য বিষয়ের যাবতীয় চিঠিপত্রাদি নারায়ণের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় নারায়ণ কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবামাচরণ সেন,
"নারায়ণ" কার্য্যাধ্যক্ষ।

নারায়ণ কার্য্যালয়, ২০৮।২। ডি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড পঞ্চম সংখ্যা

চৈত্র, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	পৌরাণিকী কথা	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১১
২।	বৃন্দাবন	শ্রীযুক্ত জলধর সেন	৪২৫
৩।	জীবন পণে (কথা-নাট্য)	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৪৩৭
৪।	অন্তর্যামী (কবিতা)	...	৪৫৬
৫।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৪৫৯
৬।	আরও কিছু আমার কথা	শ্রীমতী জগদম্বা দেবী	৪৬৮
৭।	সেকালের স্মৃতি (বঙ্কিমচন্দ্র)	শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি	৪৭৭
৮।	বংশী-ধ্বনি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	৪৮৮
৯।	বাঙ্গালার আদি নাটক	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল	৪৯১
১০।	শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল	৫০৫

কার্য্যালয়—২০৮।২। ডি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷৹ টাকা।

এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৴৹ আনা, ডাক মাশুল ৴৹ আনা।

বিজয়া প্রেসে, ২০ নং পটুয়াটোলা লেনে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরীদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২১ সাল

পৌরাণিকী কথা।

তন্ত্র ও ভক্তিসূত্র।

পুরাণ বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রের উপাসনা-তত্ত্বটা একটু বুঝিতে হইবে। উপাসনা-তত্ত্বের দুইটি শাখা আছে; এক, তান্ত্রিকী উপাসনা, দ্বিতীয়, বৈষ্ণব উপাসনা। বৈষ্ণব উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে যে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নাই, এমন কথা বলি না; তবে যামুন মুনি এবং রামানুজাচার্য্য যে ভাবে ও পদ্ধতিক্রমে উপাসনা-তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহা তন্ত্র হইতে অনেকটা পৃথক, কতকটা বিরোধীও বটে। পুরাণে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই বহু অখ্যায়িকা এবং উপাখ্যান রচিত হইয়াছে; কাজেই প্রথমে তান্ত্রিক সিদ্ধান্তেরই একটু আলোচনার আবশ্যক হইতেছে। বলিয়া রাখা ভাল যে, তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত উপনিষদের বিরোধী নহে; অনেক স্থলে বৈদিক উপনিষদের প্রমাণস্বরূপ বচন গ্রহণ করিয়া তন্ত্র বিচার করিয়াছেন। তান্ত্রিক উপনিষদ্ একসময়ে এদেশে প্রচলিত ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্‌যোগে শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কয়েকখানা তান্ত্রিক উপনিষদের আবিষ্কার করিয়াছেন। সেসকল মুদ্রিত না হইলে বুঝা যাইবে না তান্ত্রিক এবং বৈদিক উপনিষদে পার্থক্য কিসে এবং কতটুকু।

তন্ত্র বলেন জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান লইয়াই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বস্তুর পরিচয় সংগ্রহ করিতে হয়। আমি আছি, আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি, ইহাই আমার মূল জ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই অন্য জ্ঞানের উৎপত্তি। উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, আত্মাই জ্ঞানের প্রকাশক; অতএব আমি আছি—এই জ্ঞানটাই আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই আমি বুঝিতেছি যে, আমার আত্মা আছে। আমি ছাড়া জগতে—বিশ্বসৃষ্টিতে আর যাহা কিছু আছে বা থাকিতেছে, তাহা যখন আছে তখন সেসকলের মধ্যেই আত্মা আছে; নহিলে সেসকল সামগ্রী থাকিত না, এবং তাহাদের অস্তিত্বের বোধ আমার হইত না। বিশ্বব্যাপী আত্মার এবং দেহব্যাপী আত্মার মিলনচেষ্টা হইতেই উপাসনার উৎপত্তি। একা আমি থাকিতে পারি না, আমার একটা অবলম্বন চাই, তাই বাহিরের তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই। এই অনুসন্ধানই উপাসনা। উপাসনা-তত্ত্বের গূঢ় সিদ্ধান্তসকলের আবৃত্তি এখন করিব না, তাহা গভীর ও বিশাল। উহার বিচার-পদ্ধতিও অতিশয় কঠোর ও সূক্ষ্ম। আপাততঃ পুরাণের উদ্দেশ্য বুঝিতে যতটুকুর প্রয়োজন, স্বতঃসিদ্ধরূপে ততটুকু গ্রহণ করিয়া আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, বিশ্বব্যাপী আত্মা চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নির্গুণ, নেতি নেতি সিদ্ধ, অবাঙমনসগোচর; তাহার উপাসনা করি কেমন করিয়া? কুলার্ণব তন্ত্র শ্রীরামতাপনীয় শ্রুতি অনুসারে বলিতেছেন—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥"

অর্থাৎ উপাসকের কার্য্যসিদ্ধির জন্যই চিন্ময়-জ্ঞানময়-অদ্বিতীয়-অখণ্ড-অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই হেতু রুদ্রযামলে বলা হইয়াছে যে,

"সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্॥"

যখন আত্মা আমাতেও আছেন এবং সর্ব্বভূতে, সর্ব্বদেবতায়, সৃষ্টির সর্ব্বস্বে বিরাজ করিতেছেন, তখন সেই আত্মাকেই পরমানন্দরূপিণী ইষ্টদেবী মনে করিয়া আত্মারই উপাসনা করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্র শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন; তাহা এই,—

"যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং মুনে।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগদাত্মনি লীয়তে॥

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে যেমন সমুদ্রের ফেন ও তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং সমুদ্রেই লীন হয়, তেমনি আত্মা হইতেই জগৎ উত্থিত এবং আত্মাতেই লীন হইবে। আমার উপাস্য ইষ্টদেবতা ও আমি বা আমার আত্মা—অহং দেবি ন চান্যোঽস্মি—আমিই দেবী, আমা ছাড়া অন্য কেহ নাই, থাকিতে পারে না। শেষে তন্ত্র বলিতেছেন,—

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥

অর্থাৎ আত্মস্থ দেবতাকে পরিহার করিয়া যে বাহিরের দেবতার উপাসনা করে সে সাধক স্বীয় করস্থিত কৌস্তুভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচের অন্বেষণে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল বহু বচন পাওয়া যায়। প্রহ্লাদ্ বলিয়াছিলেন আমার হরি আমাতেও যেমন ভাবে বিরাজ করিতেছেন, বিশ্বচরাচরে তেমনই প্রকটভাবে বিরাজ করিতেছেন। পিতা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন—এই স্ফটিক স্তম্ভে তোমার হরি আছেন? যদি থাকেন ত, তাঁহাকে প্রকট হইতে বল। প্রহ্লাদের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, আত্মা নরহরিরূপে স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া প্রকাশ হইলেন। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে

খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে গহন বনে প্রবেশ করিল; একনিষ্ঠ-বুদ্ধি হেতু সে সিংহ শার্দ্দূলকেও হরি বলিয়া আহ্বান করিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দেহস্থ আত্মাকে না চিনিতে পারিলে বাহিরের বিশ্বাত্মাকে ঠিকমত চেনা যায় না বলিয়াই দেবর্ষি নারদ আসিয়া ধ্রুবকে দীক্ষিত করিলেন। ধ্রুব দীক্ষা পাইয়া তপস্যা করিল এবং শ্রীহরির দর্শন লাভ করিল। মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা হয়। সে মন্ত্র কি?

"মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

মনন হইতে অথবা চিন্তা হইতে যাহার সাহায্যে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহাই মন্ত্র। বেদ মন্ত্র স্বীকার করিয়াছেন, গায়ত্রী মন্ত্রই বেদের প্রধান মন্ত্র। মন্ত্র জপের প্রভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, মন নির্ব্বাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় এক চিন্তায় মগ্ন থাকিতে পারে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই আত্মদর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। এইহেতু যামলে লিখিত হইয়াছে যে, "দেবতায়াঃ শরীরস্থ বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্"—ইষ্টদেবতার রূপ বীজ-মন্ত্র জপ করিতে করিতে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে; "তস্মাৎ বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ" অতএব বীজাত্মক মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মময় হইতে পার। বৈষ্ণব সাধক হরিনামকেই মহামন্ত্র জ্ঞান করিয়া নামজপের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। বিশ্বসার তন্ত্র বলেন,—

"অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বকালেঽপি সর্ব্বদা।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যাবিচারণা॥"

অর্থাৎ শুচি অশুচি বিচার না করিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবীর মানস অর্চ্চনা করিবে। "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" বৈষ্ণবের এই উক্তিও তন্ত্রে পাওয়া যায়। তন্ত্র আবার বলিয়াছেন—"জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ" বার বার তিনবার বলিলাম জপেই সিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ইহাই হইল তন্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতির গোড়ার স্থূল কথা। তন্ত্র বলেন, ধ্যান কর আর নাই কর, মন্ত্র জপ করিতে করিতে তোমার ভাবানুকূল রূপ তোমার হৃদয়পটে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। সেই রূপ দেখিয়া ভক্ত সাধক ভক্তির সম্যক উন্মেষের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি করেন, রূপ বর্ণনা করেন। সেই স্তবস্তুতি এবং রূপ বর্ণনা শুনিয়া শিষ্য একটা রূপের কল্পনা করিয়া দেবীপ্রতিমার সৃষ্টি করেন। ইষ্টদেবীর সেই প্রকটমূর্ত্তি দেখিয়া সাধারণ লোকে তাহারই ধ্যান করিতে চেষ্টা করে; এই ধ্যানের ফলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, সাধকের জীবন ধন্য হয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশে আজকাল যেমন মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয়, পূর্ব্বে এমন ছিল না। পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু যন্ত্রের পূজা করিতেন, যন্ত্রের উপর হোম করিতেন এবং মন্ত্র জপ করিতেন। রাজা জগদ্রাম রায়ের সময় (১৪শ শতাব্দী) হইতে বাঙ্গালায় আধুনিক প্রথামত দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে কালী গড়াইয়া পূজা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দই (১৬শ শতাব্দী) চালাইয়া গিয়াছেন। জগদ্ধাত্রী পূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। সরস্বতী পূজা কখনই মাটির প্রতিমা গড়াইয়া হইত না; গ্রন্থের পূজা হইত এবং দেবী-সূক্ত পাঠ করিয়া হোম হইত। প্রতিমা গড়াইয়া সরস্বতী পূজা বোধ হয় শত বৎসরের অধিক হইবে না। বাঙ্গালা ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে এমন ভাবে মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা হয় না। মহারাষ্ট্র-দেশে গণপতি উৎসবে গণেশের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হয় বটে, কিন্তু সে মূর্ত্তি-গঠন উৎসবের অঙ্গ বিশেষ, উপাসনার আলম্বন রূপে গ্রাহ্য নহে। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে ঘটস্থাপনা করিয়া, মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া হোমযাগাদি যথারীতি হয়, প্রতিমা পূজা হয় না। তবে প্রতিষ্ঠিত দেবতার মন্দিরে যাইয়া পূজার ব্যবস্থা আছে বটে। সেসকল মন্দিরে শিবলিঙ্গ ছাড়া যন্ত্রাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড থাকে, তাহারই উপর সোনারূপার মূর্ত্তি গড়াইয়া আরোপ করা হয় মাত্র। কাশীর অন্ন-

পূর্ণা আমাদের তন্ত্রোক্ত অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি নহে, এক খণ্ড পাথরের উপর সোনার মুখ বসান মাত্র। কাশীর অনেক মন্দিরে পুরাতন সূর্য্য-মূর্ত্তি, প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি, আধুনিক দেবতার আকার ধারণ করিয়া পূজিত হইতেছেন। অনেক স্থলে ধ্যানী বুদ্ধকে বিষ্ণু সাজাইয়া পূজা চলিতেছে। বাঙ্গালায় যেমন ঘরে ঘরে মাটির মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হয়, পূজান্তে তাহার বিসর্জ্জন হয়, এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নাই, পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছিল না। দশম কি একাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই পদ্ধতির ধীরে ধীরে প্রচলন হইয়াছে। মাটির মূর্ত্তি আমরা নির্ম্মাণ করি বটে, কিন্তু পূজা করি আত্মার—আত্মশক্তির; প্রতিমা প্রতীকের মতন সম্মুখে থাকে মাত্র। দুর্গোৎসব পদ্ধতির বা কালীপূজা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমার কথার যথার্থতা সপ্রমাণ হইবে। কূর্ম্ম পুরাণে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া আছে। কূর্ম্ম পুরাণ বাহিরের মূর্ত্তি দেখিয়া ধ্যান করিতে নিষেধ করেন; উপদেশ এই যে বাহিরের মূর্ত্তি আলম্বন মাত্র, ভিতরের ধ্যান সাধকের সামর্থ্য অনুসারে চিত্তবৃত্তিনিরোধের ফলে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে।

এইবার বৈষ্ণববাদ এবং ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের কথা তুলিতে হইবে। নারদ এবং শাণ্ডিল্য ভক্তিশাস্ত্রের সূত্রকার; স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি উহার ব্যাখ্যাতা। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। ইংরেজের আমলে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার হইলে আমাদের সমাজে বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণতন্ত্রের চর্চ্চা কিছু হইতেছে বটে, পরন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের পর হইতে,—ভট্টকুমারীলের সময় হইতে অদ্বৈতাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত, এই হাজার বৎসরকাল যে আচার্য্য-পরম্পরা ভারতবাসীর ধর্ম্মের ভাবকে আকারিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বিশেষ রকমের আলোচনা ইংরেজীশিক্ষিত বিদ্বজ্জনসমাজে তেমন হয় না। অথচ শঙ্করাচার্য্যের আমল হইতে মোগল পাঠানের আমল পর্য্যন্ত এবং ইংরেজের প্রথম

আমলের ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে এই আচার্য্য-পরম্পরার মতামতের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিতেই হইবে। যাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আমি এই সন্দর্ভ-পরম্পরা লিখিতেছি, তাঁহারা আচার্য্যগণের মতবাদের সহিত সুপরিচিত থাকিলে, আমাকে অনেক কথা বার-বার বলিতে হইত না; ব্যর্থ প্রতিবাদের পিপীলিকা-দংশনও আমাকে সহিতে হইত না। যাক্ সে কথা,—স্বপ্নেশ্বর শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্যের গোড়াতেই বলিতেছেন—"প্রজাদিগের মহারাজার ন্যায়, ঐহিক এবং পারত্রিক বিবিধ ফলদাতা, বন্ধন এবং মোক্ষাদি কার্য্যে প্রভু, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা একজন ঈশ্বর আছেন এবং পিতা যেমন সাধারণতঃ সকল পুত্রের উপর স্নেহশীল হইলেও ভক্তিমান পুত্রদিগের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তিনিও সেইরূপ সকল জীবের প্রতি স্নেহশীল হইলেও ভক্তদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন।" স্বপ্নেশ্বর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদ না হইলে উপাসনা হয় না। যেখানে উপাসনার কথা, শাস্ত্র সেইখানেই দ্বৈতবাদী; বেদই বল, উপনিষদই বল, যখন উপাসনার কথা উঠিয়াছে তখনই তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পিতামাতা আমি পুত্র ইত্যাদি ভাবের উন্মেষ ঘটাইয়া তোমায় আমায়, ঈশ্বরে এবং জীবে বিষম পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষকে উপাসনা করিতেই হইবে; উপাসনা জীবের প্রকৃতিসিদ্ধ ব্যাপার। নিজের অপেক্ষা প্রবলতর শক্তি দেখিলেই মানুষ সেই প্রবল শক্তির উপাসনা করিয়াই থাকে। অতএব রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন যে, মনুষ্যে যখন উপাসনার প্রবৃত্তি প্রকৃতিগত, সুতরাং সনাতন, তখন উপাস্যও জীব হইতে নিত্য স্বতন্ত্র এবং সনাতন। কাজেই বলিতে হয় যে, জীবে ও ঈশ্বরে, উপাস্য এবং উপাসকে কখনই সম্মিলন সম্ভবপর নহে; উভয়েই স্বতন্ত্র এবং পৃথক, উভয়ই নিত্য। ইহা মায়াবাদের স্পষ্ট প্রতিবাদ। স্বপ্নেশ্বর বলেন যে, বেদান্তে ও উপনিষদে যাহা থাকে, বা যাহা আছে তাহা থাকুক; উহার সহিত মনুষ্যসমাজের কোন সম্পর্ক নাই; উহা আরণ্যক

শাস্ত্র। সাধারণ মানুষ ঘর-গৃহস্থলী চালাইবে, ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, পূজা-পাঠ করিবে। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অদ্বৈতবাদ অবোধ্য। লোকসমাজে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলে, জীব-শিব এক বলিয়া কীর্ত্তন করিলে নাস্তিকতার পুষ্টি হইয়া থাকে, ঘুরিয়া-ফিরিয়া মানুষ বুদ্ধের শূন্যবাদের গর্ত্তে আসিয়া পতিত হয়। অতএব লোকসমাজের হিতের জন্য দ্বৈতবাদ, পূজ্য-পূজক ভেদবাদ প্রচার করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহার পরে শাঙ্কর মত এবং বৈষ্ণব মতের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া মাধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, নিম্বাদিত্য প্রভৃতি কত প্রতিভাশালী আচার্য্য যে কত মতের এবং কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার হিসাব করিয়া বলা যায় না। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এমন কত বাদই আছে। সকল বাদের সকল রকমের সিদ্ধান্ত নানা আকারে পুরাণে স্থান পাইয়াছে। দ্বৈতবাদমূলক বৈষ্ণবী ভক্তিব্যঞ্জক গোটাকয়েক শ্লোক বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব :—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোমে রমতাং তদ্বৎ পরমাত্মনি কেশবে ॥
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥"

অর্থাৎ "অবিবেকীদিগের ভোগ্য বস্তুতে যাদৃশ স্থির প্রীতি উৎপন্ন হয়, তোমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ আমার হৃদয়েও সেইরূপ প্রীতি জন্মিয়াছে; উহা যেন আমার হৃদয় হইতে আর অপসৃত না হয়। যুবতীদিগের যুবা পুরুষের উপর এবং যুবা পুরুষের যুবতীদিগের উপর চিত্ত যেরূপ আসক্ত হয়, আমার চিত্ত যেন সর্ব্বদা সেই পরমাত্মা কেশবের প্রতি সেইরূপ আসক্ত থাকে। হে নাথ,

হে অচ্যুত, আমি যে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, সেই-সকল জন্মেতেই তোমার প্রতি আমার যেন স্থির ভক্তি থাকে।" এই ভাবের কত শ্লোক যে পুরাণে আছে তাহার আর হিসাব করিয়া বলা যায় না। বাল্মীকি রামায়ণ হইতে একটা শ্লোক তুলিয়া দিব। হনুমান্ বলিতেছেন (সুন্দরাকাণ্ড)—

"যাবদ্রামকথা লোকে তাবৎ প্রাণান্ বিভর্ম্যহম্।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥"

গীতায় ভক্তিযোগ বর্ণনকালে দ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তটা শ্রীভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥"

পুরাণ সকল বাদের সমাহার; যে বাদের অনুকূল বচন চাহিবে, উহাতে তাহাই পাইবে। পুরাণকে বাছিয়া গোছাইয়া পড়ার নিয়ম নাই বলিয়া, পুরাণ লইয়া অনেক সময়ে অনেক গোল ঠেকে। তাই পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, পুঁথি লইয়া পুরাণ পাঠ করিবে না, পুরাণ ব্যাখ্যাতার মুখে বা ব্যাসের মুখেই শুনিতে হয়। অথবা পুঁথি পাঠ করিতে হইলে, গুরুমুখ করিয়া পড়িতে হইবে। অর্থাৎ গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া পুরাণ পাঠ করিতে হইবে, যেখানে সন্দেহ হইবে, সংশয় জন্মিবে সেইখানে প্রশ্ন করিবে, গুরু সন্দেহ নিরসন করিবেন, সংশয়ের সমাধান করিবেন। শিষ্যের কর্ত্তব্য গুরুকে পুরাণ পড়িয়া শুনান; গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে পুরাণের গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, পুরাণ বেদব্যাসের রচিত। অথচ বচন

আছে—"ব্যাসাদি মুনিভিঃ রচিতং"—কোন্ ব্যাস যে তাহারও নির্দ্দেশ নাই। কাশীর পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই কান্তাবাণীর রচনা করিতে পারেন। বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগে দেখিয়াছি ৺ বীর নৃসিংহ শাস্ত্রী পুঁথির বচন পড়িতে না পারিলেই স্বয়ং সেই স্থানে দুইটা বা দশটা অনুষ্টুপ্‌ছন্দের শ্লোক রচিয়া দিতেন। আগে বটতলার প্রকাশকগণের অধীনে অনেক কবি ও পণ্ডিত থাকিতেন, যাঁহারা আদেশমত পুরাণ রচিয়া দিতে পারিতেন। কাশীতে ডাক্তার ব্যালেণ্টাইনকে একখানা গোটা ভবিষ্যপুরাণ নূতন করিয়া রচিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাশ্মীরেও এইভাবে দুই একখানা উপপুরাণ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। ইহা দোষের নহে; আসল খাঁটি হিন্দু ইহাতে চটেন না। তাঁহারা দেখেন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসকল যথারীতি সরল প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না। সিদ্ধান্ত বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা থাকিলেই, পুরাণের লক্ষণযুক্ত হইলেই যে কেহই লিখুক না কেন, হিন্দু সমাজ তেমন পুরাণ শুনিতে বা তাহাকে পুরাণ বলিয়া মান্য করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন না।

বৎসর খানেক পূর্ব্বে ইতালীর মহাকবি দান্তের (Dante) কাব্যালোচনা করিতে যাইয়া আমি বলিয়াছিলাম দান্তের মহাকাব্য কতকটা আমাদের পুরাণের ধরণে লেখা। দান্তের মহাকাব্য সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইলে ঠিক একখানি উচ্চাঙ্গের খৃষ্টপুরাণ হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপের আর কোন দেশের মহাকবির মহাকাব্য সংস্কৃত পুরাণের আদর্শের এতটা অনুকূল নহে। পুরাণের ভাষা আবার স্বতন্ত্র। উহার শব্দযোজনা-পদ্ধতি, উহার শব্দের দ্যোতনা সাধারণ সংস্কৃত মহাকাব্য অপেক্ষা পৃথক। দান্তের, সেক্ষপীয়রের, মিল্টনের যেমন lexicon আছে, তেমনি প্রত্যেক পুরাণের ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতি ত্যাগ করিলে পুরাণ ঠিকমত বুঝা যায় না। ধরণী কথকের সময় পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কথকগণ রামায়ণ,

মহাভারত, ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি জানিতেন। ৺মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ভাগবত ব্যাখ্যা যে শুনিয়াছে, সেই জানে তাঁহার ব্যাখ্যা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল। এসকল পদ্ধতি গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলিতেন যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা কল্পলতিকা, যাহার যেমন অভিলাষ তেমনই অর্থ উহা হইতে সে বাহির করিতে পারে। তবে গুরু-মুখ-শ্রুত অর্থই গ্রাহ্য, কারণ সে অর্থ সিদ্ধ সাধকের মস্তিষ্ক-প্রতিভাত। আমি জানি মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় যখন ভাগবতের কোন শ্লোকের অর্থ মনোমত করিতে পারিতেন না, তখন তিনি উপবাস করিয়া, ধর্ণা দেওয়ার মত, নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া থাকিতেন। কখনও কখনও দুই তিন দিন একভাবে কাটিয়া যাইত, তাহার পর প্রত্যাদিষ্টের মতন উঠিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেন এবং সমন্বয় সাধন করিতেন। এই ভাবে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া শাস্ত্রার্থ বাহির করিবার পদ্ধতি রামানুজাচার্য্যের সময় হইতে এদেশে প্রচলিত আছে।

পুরাণের আখ্যায়িকা-উপাখ্যান সকলের কতটুকু গ্রাহ্য এবং কতটুকু অবহেলার যোগ্য তাহার বিধিও নির্দ্দিষ্ট ছিল। লীলা আখ্যান যাহা, তাহার রস গ্রহণ করিতে হয়, ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে নাই। কোন্ লীলায় কোন্ রসের উন্মেষ ঘটিতেছে, কেবল তাহারই বিচার করিতে হয়, ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে নাই। যাহা ইতিহাসের উপাখ্যান তাহার ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়; যেমন হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, নলোপাখ্যান ইত্যাদি। কারণ ঐতিহাসিক উপাখ্যানে ঘটনার দ্বারা চরিত্রের উন্মেষ সাধিত হয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে ঘটনাই মুখ্য। যাহা অর্থবাদের আখ্যায়িকা তাহা কিসের রোচক, কোন তত্ত্বের প্রকাশক, তাহা বুঝিতে পারিলেই হইল। পুরাণ সত্যমিথ্যা লইয়া চিন্তিত নহেন; পুরাণের কেবল দৃষ্টি সিদ্ধান্তের দিকে, রসোন্মেষের দিকে, তথ্যনির্ণ-

য়ের দিকে। হিষ্ট্রীর সত্য পুরাণের সত্য নহে। বুদ্ধের জাতক সকল বৌদ্ধের পুরাণ। কোন কোন ইংরেজ ও জর্ম্মণ পণ্ডিত বলেন যে, বুদ্ধের জাতকের অনুকরণেই পুরাণের সৃষ্টি। রামায়ণ মহাভারতের ইতিহাস-কথার যে কত পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই জানেন। ভাসের নাটকগুলি পাঠ করিলেও মনে হয় না যে, আধুনিক মহাভারত ভাসের সময়ে প্রচলিত ছিল। কালিদাসের সময় হইতে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে কবিগুরু বাল্মীকির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। জাতকে যে রাম-সীতার কথা আছে তাহাও অদ্ভুত ও উৎকট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পুরাণগুলিকে বেজায় আধুনিক বলিয়া মনে করেন। কোন কোন পুরাণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত বলিয়া বহু পণ্ডিতের অনুমান। সে যাহা হউক, পুরাণ হিন্দুসমাজের আলেখ্য। পুরাণ বুঝিতে পারিলে ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির আদর্শের কথা কতকটা জানা যায়। কি উপায়ে আমরা আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাও পুরাণপাঠ করিলে বুঝা যায়। পুরাণ যেন পদে পদে জাতির বিশিষ্টতায় তালি দিয়াছে, যেন উহার উন্মেষ সাধনে নানা উদাহরণের সাহায্যে ব্যস্ত হইয়াছে। পুরাণ পড়িলেই মনে হয় নাস্তিকতার অপসারণ জন্য পুরাণকার প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—যে কোন সম্প্রদায়ের পুরাণ খুলিয়া পাঠ করুন না, দেখিবেন পুরাণকার নানা প্রকারের গল্পগাছা করিয়া, নানা দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ব্যাপ্তত্ব, নৃত্য প্রতিষ্ঠাপিত করিতেছেন। যেন মনে হয়, একটা বিশাল নাস্তিকতার ঢেউ সমাজের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার ফলে সমাজ-অঙ্গনে কিলাসের ও অবিশ্বাসের পলিমাটি জমিয়া গিয়াছে; পুরাণ তাহাই পরিষ্কার করিবার জন্য সদা ব্যস্ত।

পুরাণ লোকশিক্ষার গ্রন্থ, সমাজ-শাসনেরও গ্রন্থ। পুরাণে প্রধা-

নতঃ এই কয়টি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে;—(১) ঈশ্বরে বিশ্বাস, সে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তরাত্মা হইলেও আমা ছাড়া—সাধক ছাড়া স্বতন্ত্র পদার্থ, সাধ্য ও সাধকের বিভেদ বিচার সকল পুরাণেই স্পষ্ট করিয়া করা হইয়াছে। (২) একনিষ্ঠা,—যখন যে ভাবে যে দেবতার উপাসনা করিব, তখন তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ব দুঃখ ও পাপ-হর, সাধকের দৃষ্টিতে তখন তাঁহার অপেক্ষা বড় কেহ নাই। একনিষ্ঠা হইল উপাসনার মহাপ্রাণ; যে উপাসক সেই একনিষ্ঠ সাধক। (৩) ঈশ্বরে মনুষ্যত্বের আরোপ; তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সাধক যখন মানুষ, সাধকের ঈশ্বরও তখন মানুষ; সাধকের একাদশ আসক্তি ও ষড়রিপু লইয়া তাহার ইষ্টদেবতার সৃষ্টি। সাধকের সাধ মিটাইবার জন্য ইষ্টদেবতার উন্মেষ; সুতরাং সাধক যেমন, সাধকের ঈশ্বরও তেমনই হইবেন। এই মানবতাবাদ পুরাণে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত। (৪) ঈশ্বরে—ইষ্টদেবতায় সাধকের সর্ব্বস্ব নিবেদন;—প্রবৃত্তির মুখে সর্ব্বস্ব নিবেদন, নিবৃত্তির মুখেও সর্ব্বস্ব নিবেদন। প্রবৃত্তির মুখে সর্ব্বস্ব নিবেদনের তত্ত্বটা শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার ঘর-সংসার, ধন-দৌলত, পুত্র-পরিবার সকলই আমার ইষ্টদেবতার, আমি কেবল তাঁহার প্রসাদভোজী মাত্র। আমি যাহা করিব, সে সকলের ফলাফল ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া করিব। ইহ সংসারে আমি যেন তাঁহার নায়েব, তাঁহার গোমস্তা, তাঁহার ইসারায়, তাঁহার ইঙ্গিতে আমি অর্থোপার্জ্জন করিতেছি, ঘরবাড়ী করিতেছি। নিবৃত্তির মুখে সর্ব্বসমর্পণের তত্ত্ব গীতায় পরিষ্কার করিয়া বুঝান আছে। প্রবৃত্তির ধর্ম্ম সকাম, কিন্তু সে কামনা ঈশ্বর সেবায় বিনিযুক্ত; নিবৃত্তির ধর্ম্ম নিষ্কাম, কেননা আমার কর্ম্মের ফলাফল আমি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছি। এই দুইটি তত্ত্ব পুরাণ নানাবিধ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। (৫) সমাজ-ধর্ম্ম বা সমাজ-শরীরের ধর্ম্ম কেমন হওয়া

উচিত, তাহার ব্যাখ্যা। ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিলে, কেমন রাজা, কেমন প্রজা হইলে, কেমন পিতা কেমন পুত্র, কেমন পতি কেমন পত্নী হইলে সমাজের ঔজ্জ্বল্য সাধন হয় তাহার ব্যাখ্যা। এই সম্বন্ধে কথা কহিতে যাইয়া পুরাণ নানা যুগের সমাজের নানা অবস্থার কথা তুলিয়াছেন। সমাজের কোন পর্য্যায়ের কোন কথা, তাহা বুঝিতে পারিলে, পুরাণের ভিতরের কথা অনেকটা বুঝা যায়। (৬) ফলশ্রুতি,—কোন্ কর্ম্মের কেমন ফল, কি অবস্থায় কোন্ কার্য্যের ফল কিরূপ আকার ধারণ করে তাহার বিশ্লেষণ। এই বিষয়েই পুরাণের বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া পুরাণের তিনটা স্তর আছে—ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাধনার স্তর। ঐতিহাসিক স্তরটা দৃষ্টান্তের হিসাবে প্রযুক্ত; সামাজিক স্তর বিশ্লেষণপ্রধান; সাধনার স্তর ফলশ্রুতিপ্রধান। কোন্ সাধনার কি ফল, তাহা এক একটা আখ্যায়িকার সাহায্যে দেখান হইয়াছে।

পুরাণ বুঝিতে হইলে কি ভাবে পুরাণ পড়িতে হইবে, মোটামুটি তাহারই গোটাকয়েক কথা আহরণ করিয়া পাঠকগণকে দিলাম। আমার সঙ্কলিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা সপ্রমাণ করিতে হইলে এক-একটি পুরাণ ধরিয়া আলোচনা করিতে হয়। আপাততঃ তাহার প্রয়োজনাভাব। কারণ, পুরাণপাঠের নিষ্ঠা সমাজে প্রকাশ না হইলে, সে পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। কাজেই এ বিষয়ের এই খানেই পরিসমাপ্তি করিলাম। পুরাণ যে এলোমেলো ব্যাপার নহে, তাহা বোধ হয় এই তিনটা প্রবন্ধে স্পষ্ট করিতে পারিয়াছি। পুরাণ পাঠের জন্যও বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃন্দাবন

বৃন্দাবনের কথা লিখিবার জন্য পুনরায় আমার উপর আদেশ হইয়াছে। ইহাতে আমি বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছি, কিন্তু ইহাতে 'নারায়ণের' গৌরব বৃদ্ধি হইবে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু সে কথা বলিয়া অব্যাহতি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমাকে লিখিতেই হইতেছে। অতএব, 'নারায়ণের' পাঠকপাঠিকাগণের মনোযোগ ভিক্ষা করিয়া আমি কথা আরম্ভ করিলাম। এবার আর গৌরচন্দ্রিকা করিয়াই অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত করিব না। ইহা শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, আমি আগাগোড়া জ্ঞাতব্য কথারই অবতারণা করিব, তাহা হইলে তিনি যে ভুল বুঝিয়াছেন, সে কথা বুঝিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইবে না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন হয় ত বৃন্দাবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেক পুরাতন জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদের স্থানে হয় ত অনেক নূতন দৃশ্য মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমি বৃন্দাবনের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই; অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলি, আমি আজকালকার হিসাবে ভ্রমণ বৃত্তান্তও লিখিতেছি না। আমি আমারই কথা লিখিতেছি,—আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমি নোটবুক হাতে করিয়া বৃন্দাবনে যাই নাই; বৃন্দাবনের কোন্ মন্দিরটা কত উচ্চ, কোন্ মন্দিরের বয়স কত, কোন্ মন্দিরের কারুকার্য্য কোন্ শ্রেণীর, এসকল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্যও আমি সেখানে যাই নাই। পূর্ব্বকালের ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ করিবারও গৌরবময় উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি গিয়াছিলাম বৃন্দাবন দেখিতে,—তোমাদের ভূগোলে লিখিত বৃন্দাবন

দেখিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না ; আমি মন্দির বা মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহ দেখিবার জন্যও যাই নাই। আমি যাহা দেখিতে গিয়াছিলাম, যাহা শুনিতে গিয়াছিলাম, তাহার কথা কি বলিয়া বুঝাইব ? আমি গিয়াছিলাম শুনিতে—

"রাধানামে সাধা বাঁশী
তেমনই ক'রে বাজে কি না ?
(জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে)"

আমি গিয়াছিলাম বৃন্দাবনে দেখিতে—

"যমুনা-কুঞ্জতটে বংশীবটে সে মাধুরী।
তারে চিন্‌তে নারি, নর কি নারী, সুন্দর কি সুন্দরী।"

আমি গিয়াছিলাম দেখিতে

"রাই নাচে বাঁশীর স্বনে, কৃষ্ণ নাচে রাধার সনে,
পবন হিল্লোলে দোলে পীতাম্বর নীলাম্বরী।"

আমি গিয়াছিলাম শুনিবার জন্য—

"এই, হিয়া দগ্‌দগি, পরাণ পুড়নি
কি দিলে হইবে ভাল।"

বৃন্দাবনে যাইয়া আমার এ সাধ, এ আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছিল কি ? আমি যাহা দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম, যাহা শুনিবার জন্য গিয়াছিলাম, তাহা কি দেখিয়াছি ? তাহা কি শুনিয়াছি ? সে শুভাদৃষ্ট হইলে আজ এমন করিয়া শুষ্ক হৃদয়ে বেড়াইতে হইত না, এমন করিয়া পথে পথে ঘুরিতে হইত না, এমন করিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।—সে কথা থাকুক, যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

পাঠকপাঠিকাগণের হয় ত মনে আছে যে, আমি বৃন্দাবনে যাইয়া এক দিনের আধ ঘণ্টার পরিচিত পথিককে বহুদিনের পরিচিত বন্ধু-রূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অজ্ঞাতসারে সেই বন্ধুর আশ্রমেই অতিথি হইয়াই বুঝিয়াছিলাম, বনে জঙ্গলে, দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে

যে মঙ্গলময় বিধাতা আমার আশ্রয় মিলাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনিই আজ আমার হস্তধারণ পূর্বক এই বাবাজির আশ্রমে পৌঁছা-ইয়া দিয়া গেলেন। তবুও অন্ধ আমরা বলি "কৈ তুমি, কোথায় তুমি নারায়ণ!" তবুও সন্দেহ, তবুও তাঁহার মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস!

বাবাজি আমাকে পাইয়া যে কি করিবেন, কোথায় বসাইবেন, তাহাই ভাবিয়া পাইলেন না ; তাঁহার আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। আধ ঘণ্টার সামান্য পরিচিত পথিককে পাইয়া এত আনন্দ প্রকাশ করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি একে ডাকি-তেছেন, ওকে বলিতেছেন ;—আমি ত অবাক্। এদিক ওদিক যান, আবার দৌড়িয়া আসিয়া একই কথা বলেন, "শ্যামসুন্দর আজ কৃপা করিয়া এমন অতিথি মিলাইয়া দিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "আমাকে পাইয়া আপনি যে শ্যামসুন্দরের সেবা ভুলিতে চলিলেন!" তিনি বালকের ন্যায় 'হাঃ হাঃ' করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আজ যে আমার ঘরে বাহিরে শ্যামসুন্দর।" বাবাজির ব্যবহারে, তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতায় আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম ; বুঝিলাম, ইহারই নাম 'তৃণাদপি সুনীচেন', ইহারই নাম 'অমানীনা মান দেন'। একজন প্রকৃত বৈষ্ণব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম ; এমন সাধুসঙ্গলাভে পবিত্র হইলাম।

যথাসময়ে স্নান করিয়া শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পাইলাম। যমুনায় স্নান করিতে যাইতে চাহিয়াছিলাম, বাবাজি যাইতে দিলেন না ; বলি-লেন, "এত রৌদ্রে বাহির হইয়া কাজ নাই।"

রাত্রিতে ষ্টেশনে ও রেলগাড়ীতে নিদ্রা হয় নাই বলিলেই হয়। তাই আহারান্তেই শয়ন করিলাম ; তাহার পর নিদ্রা। যখন নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, তখন অপরাহ্ন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখি বাবাজি ভাগবত পাঠ করিতেছেন, আর আট দশজন স্ত্রীপুরুষ তাঁহার আশে পাশে সম্মুখে বসিয়া একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই আশ্রমেরই অপর এক বাবাজি

আমার উপবেশনের জন্য একখানি আসন আনিয়া দিলেন। আমি আসনখানি সরাইয়া রাখিয়া মৃত্তিকাসনেই বসিয়া পড়িলাম। বাবাজি অতি সরল ভাষায় ভাগবতের শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দেখিলাম বাবাজি শুধু ভক্তই নহেন, তিনি মহাপণ্ডিত; গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত অচলা ভক্তি সম্মিলিত হইয়া বৈষ্ণবপ্রবরকে বড়ই মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

প্রায় আধ ঘণ্টার উপর তাঁহার ভাগবতপাঠ শুনিলাম। তাহার পরই তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আজ এই স্থানেই শেষ করি। গৃহে অতিথি আছেন; তাঁহাকে দর্শন করাইতে লইয়া যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি অতি বিনীত ভাবে বলিলাম, "আমার জন্য পাঠ বন্ধ করিবেন কেন? শ্রীধাম ত পলাইবার বস্তু নহে; আজই দেখিবার এত তাড়াতাড়ি কি? আর যাহা দেখিবার, যাহা শুনিবার, তাহা ত এখানেই দেখিতে শুনিতে পাইতেছি। আপনি পাঠ করুন।" তিনি সে কথা শুনিলেন না, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। আমি বলিলাম, "আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? যাইতে হয় ত আমি একেলাই যাইব। আপনি এসব ফেলিয়া আমাকে লইয়াই ব্যস্ত হইবেন না। ইহাতে যে আমার অপরাধ হইতেছে।" বাবাজি হাসিয়া বলিলেন, "নরসেবাই নারায়ণের সেবা। বাহিরের সুন্দরদের সেবা করিলেই শ্যামসুন্দরের সেবা হয়। ভুলিবেন না নরই নারায়ণ! হরি দাসের সেবা না করিলে হরিসেবা হয় না।" হায় বাবাজি! যদি শ্রীহরির দাসই হইতে পারিতাম, তাহা হইলে এমন করিয়া পথে পথে বেড়াইতাম না—তাহা হইলে এমন করিয়া বাঁধনের উপর বাঁধন আঁটিতাম না। কিন্তু তখন আর সে কথা বলিবার অবকাশ পাইলাম না;—দ্বারের বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শুনিয়াই বাবাজি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই আমার সেই মথুরার সঙ্গী যুবকটিকে সঙ্গে লইয়া বাবাজি আশ্রম-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্যবদনে বলি-

লেন, "এই দেখুন, আপনার ভক্ত বন্ধু ব্রজনন্দন প্রসাদ আসিয়াছেন কথাটা বলিতে লজ্জা নাই যে, যিনি এত যত্ন করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত সমস্ত রাত্রি রেলে কাটাইয়া আসিয়াছি, ইংরাজি আদবকায়দার খাতিরে তাঁহার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। এই রকম শিষ্টাচারই আমরা শিখিয়াছি! বাবাজির কথায় জানিতে পারিলাম যে, আমার যুবক বন্ধুটির নাম ব্রজনন্দন প্রসাদ! আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলাম, "আপনি এত তাড়াতাড়িই যে এলেন? আপনার মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?" যুবক বলিলেন, "তিনি ভালই আছেন। আপনার ত আসিতে কোন অসুবিধা হয় নাই? এখানে ত কোন কষ্ট হইতেছে না?" আমি বলিলাম, "আপনি যাঁহার কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি যে আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু।" বাবাজি তখন হাসিয়া বলিলেন, "প্রসাদ, তোমারই জন্য আমার এই বন্ধুদর্শন হইল।" প্রসাদ বলিলেন, "বাবুজিকে তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়াছি বলিয়া বাবা মা আমাকে কত অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।"

বাবাজি বলিলেন, "প্রসাদ, তাহা হইতেছে না; আমি ইঁহাকে শীঘ্র ছাড়িতে পারিব না।"

তখন দুইজনে অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক রহস্যালাপ হইয়া স্থির হইল যে, সেদিন আমি বাবাজির আশ্রমেই থাকিব, পরদিন অপরাহ্নকালে মথুরায় যাইব।

আমি আর এতক্ষণ কিছু বলি নাই; যখন তাঁহাদের ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল, তখন বলিলাম, "তাহা হইলে হে যুবক অক্রূর, আপনি কা'ল রথ লইয়া আসিবেন, আমি বৃন্দাবন আঁধার করিয়া মথুরায় চলিয়া যাইব।" আমার এই কথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন।

বাবাজি তখন বলিলেন, "প্রসাদ, তুমি তাহা হইলে ইঁহাকে একবার দেখাইয়া শুনাইয়া আন।"

প্রসাদ বলিলেন, "আপনিই বলিয়া দিন, কোথায় কোথায় ইঁহাকে লইয়া যাইব।" বাবাজি উত্তর করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিলাম, "আগে ত যমুনা দর্শন করি; তাহার পর অন্য কথা।"

বাবাজি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে প্রথমে যমুনাই দেখাও; তাহার পর গোবিন্দজির মন্দিরে লইয়া যাইও।"

যুবক তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরে গেলেন। লালাবাবুর মন্দিরের সম্মুখ দিয়া আমরা যমুনাতীরে গমন করিলাম। কিন্তু কৈ, সে যমুনা কৈ?

"যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি"

সে যমুনা কৈ? এ যে একটা মরা নদী। এ নদীর অপর পারে যে দিগন্তবিস্তৃত বালুকারাশি, এ নদীর সামান্য জলরাশি যে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে! আমি যে যমুনা দেখিতে আসিয়াছি, এ ত সে যমুনা নহে; এ যমুনার তীরে ত কিশোর কিশোরীর মধুর প্রেমাভিনয় হয় নাই; এ যমুনা ত শ্যামের বাঁশী শুনিয়া উজান বহিতে পারে না, এ যমুনা ত প্রেমের হিল্লোলে নাচে না। আমি প্রসাদকে বলিলাম, "আমি এ যমুনা দেখিতে চাহি না।" প্রসাদ বলিল, "এই ত যমুনা, দোসরা আর যমুনা নাই।" আমি বলিলাম, "এই যদি যমুনা হয়, তাহা হইলে আমার দেখা শেষ হইয়াছে; এখন চলুন বাবাজির আশ্রমে যাই।"

প্রসাদ বলিলেন, "গোবিন্দজির মন্দির, আর আর মন্দির দেখিবেন না? এখনও ত কিছুই দেখা হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "কিছুই দেখা হয় নাই; কিছু যে দেখা হইবে, তাহাও ত মনে হয় না। যেমন করিয়া দেখিতে হয়, যে সাধনফলে বৃন্দাবন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমার নাই। আমি বৃথা

এখানে আসিয়াছি। তবে যখন আসিয়াছি, তখন সহরটাই দেখিয়া লই; বৃন্দাবনদর্শন আমার অদৃষ্টে নাই।"

প্রসাদ বলিলেন, "তাহা হইলে এখন কোথায় যাইবেন?"

আমি বলিলাম, "সহর দেখিগে চলুন।" এই বলিয়া প্রসাদের সঙ্গে অগ্রসর হইলাম।

এখন তাহা হইলে সহরের কথাই বলি, কারণ সেদিন আমি সহরই দেখিয়াছিলাম। সহরে দেখিয়াছিলাম অসংখ্য মন্দির আর অগণিত বানর। আমি সেদিনের বৃত্তান্ত বলিতে হইলে, তাহাই বলিব। তাহার পর আর কিছু বলিতে পারিব না—বৃন্দাবনের কথা বলিতে পারিব না। যাঁহারা বৃন্দাবন প্রকৃতপক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই শুনিবেন—আমার কথা নহে; যাঁহারা বৃন্দাবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা পাঠ করুন—ভক্তের বৃন্দাবন মানসচক্ষে দেখিতে পাইবেন। আমি দেখিয়াছিলাম বড় ছোট মন্দির, আমি সেদিন দেখিয়াছিলাম অসংখ্য ভালমন্দ নরনারী, আর আমি দেখিয়াছিলাম বানর। ইহার অধিক আমি দেখিও নাই, বলিতেও পারিব না। আমার কাছে মন্দিরের বৃত্তান্ত শুনুন—বানরের কথা শুনুন।

শ্রীগোবিন্দজির মন্দির—শুনিলাম এই মন্দির নাকি বৃন্দাবনের অন্য সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল; এত উচ্চ ছিল যে সুদূর দিল্লী হইতেও এই মন্দিরের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। আর মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর ছিল। সাধক যেখানে যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা মহার্ঘ পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ইষ্টদেবতার মন্দিরে লাগাইয়াছিলেন। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়াছে। মুসলমান বাদশাহ আওরঙ্গজেব নিজের মস্তক অপেক্ষা আর কাহারও মস্তক উন্নত দেখিতে পারিতেন না; বিশেষতঃ যেখানে সেখানেই যে হিন্দুর দেবমন্দির সকল মস্তক উন্নত করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া

হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবে, স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ মোগল বাদসাহ তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি কাশী প্রভৃতি অনেক স্থানের দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; শ্রীগোবিন্দজির মন্দিরের সেই অভ্রভেদী চূড়াও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই—তিনি এই মন্দিরের চূড়াও ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে শ্রীগোবিন্দজি পুরাতন মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটা গলির মধ্যে আর একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এখনও সেখানেই বিরাজ করিতেছেন। এই গোবিন্দজি বহুকাল পূর্ব্বে বনের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। গাভীসকল বনে বিচরণ করিবার সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দজিকে দুগ্ধ পান করাইয়া আসিত। পরে ভক্ত-প্রবর রূপ ও সনাতন যখন বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক "কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে পাগলের মত ছুটিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দজিকে বনের মধ্য হইতে তুলিয়া আনিয়া বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শেঠের মন্দির—এখন যদি মন্দির দেখিতে হয়, তবে সে শেঠের মন্দির। দেখিবার মত মন্দির বটে! অর্থে যদি দেবতার কৃপা লাভ করা যায়, লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া নানা কারুকার্য্য-শোভিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি মোক্ষলাভ করা যায়, তাহা হইলে ধনকুবের লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ মহাশয় তাহা লাভ করিয়াছেন। ১২৬৩ সালে এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়া শ্রীরঙ্গজিদেবের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং যেখানে যা সাজে, অর্থব্যয় করিয়া মন্দিরকে যতদূর সৌন্দর্য্যবিভূষিত করা যাইতে পারে তাহার ত্রুটি হয় নাই—শেঠজির ধনাগার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল। প্রকাণ্ড মন্দির, প্রকাণ্ড চত্বর, প্রকাণ্ড প্রাচীর, বিস্তৃত সরোবর, দীর্ঘকায় সোনার তালগাছ, অসংখ্য দাসদাসী, অগণ্য সেবাইত, প্রশস্ত অতিথিশালা—আর প্রচুর ভোগের আয়োজন! ভোগী কিন্তু নির্লিপ্ত! দেবতা নানা বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া নীরব, নিস্পন্দ, নিশ্চল! ঐশ্বর্য্যের

মধ্যে দেবতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। আমার মত অভাজন মন্দির দেখিয়া বলিল, "হাঁ, মন্দির বটে!" দেবতা! দেবতা! কোথায় তুমি?

এই দুইটি মন্দির দেখিয়াই সেদিনের মত বাবাজির আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম; ব্রজনন্দন প্রসাদ মথুরায় চলিয়া গেলেন।

বিশ্রামের পর বাবাজির শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বারান্দায় বাবাজির নিকট উপবেশন করিলাম। তিনি বলিলেন, "আজ কি কি দেখিলেন?" আমি বলিলাম, "মন্দির আর বানর।" বাবাজি আমার কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, "মন্দির এখানে অনেক আছে, বানরও অনেক, কোন নরের সাক্ষাৎ কি পাইলেন না?" আমি বলিলাম, "বাহিরে ত এখনও পাইলাম না—এই আশ্রমে অবশ্য পাইয়াছি। বাহিরে সবাই আমারই গোষ্ঠী।" বাবাজি হাসিয়া বলিলেন, "যমুনা দর্শন হইয়াছে কি?" আমি বলিলাম, "যমুনা দর্শন হয় নাই, তবে একটা নদী দেখিয়াছি।"

এইবার বাবাজির মুখ গম্ভীর হইল। তিনি অতি ধীর স্বরে বলিলেন, "ভাই, বৃন্দাবন দেখিবার জন্য, যমুনা দেখিবার জন্য সব ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া আছি; কিন্তু আমারও কিছুই দর্শন হইল না। শ্যামসুন্দরের কাছে প্রতিদিন ঐ প্রার্থনাই ত করিয়া থাকি; ঐ কথাই ত জপ করিয়া থাকি। কিছুতেই কিছু হয় না ভাই! কিছুই হয় না! এ জীবন এমনই করিয়া কাটিয়া যাইবে। এখনও যে অহঙ্কার আছে—এখনও যে বাসনা আছে।" এই বলিয়াই বাবাজি তাঁহার মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"ওরে, জটিলা কুটীলা আমার বাসনা।
আমি, ভজন পূজন কি করিব, নাম সাধনই হোলো না।
আমি মনেতে করি, গৃহ সাধন-বৈরী,
বনে যাব, নাম করিব দিবাসর্ব্বরী;
ওরে, বাসনা থাকিলে মনে বনে গেলেও যন্ত্রণা।"

বাবাজি প্রাণের আবেগে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বারবার এই গানটি তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। আর আমি—আমি চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার এই ভাবোন্মত্ততা দেখিতে লাগিলাম। আর তখন মনে হইতে লাগিল;—এই বিদ্বান পণ্ডিত সদ্বংশজাত ভদ্রলোক সংসার ছাড়িয়া, সব ত্যাগ করিয়া যে বৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়া পড়িয়া আছেন, দিনরাত তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্যামসুন্দরের কাছে বৃন্দাবন-দর্শন ভিক্ষা করিতেছেন; তিনিই যখন কাতর, তাঁহার আশাই যখন এখন পর্য্যন্তও মিটিল না; তখন আমি কামনার দাস, বাসনার গোলাম, ধনমান যশঃ পিপাসু,—আমি কোথাকার কে? সাধন নাই, ভজন নাই—মুক্তি লাভের প্রয়াসী; ঢাল নাই তলোয়ার নাই—নিধিরাম সর্দ্দার!

গান শেষ হইয়া গেলে বাবাজি বলিলেন, "ভায়া, তোমাকে আর 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেছি না—তুমি বলিলে সখ্য ভাবের আভাস পাই। এখন জলযোগ কর, তাহার পর চল দুই-জনে একটু বেড়াইয়া আসি। বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কি বল?" আমি বলিলাম, "আমার কোন আপত্তি নাই, এখনই চলুন না।" তিনি বলিলেন, "চল এখনই যাই, ফিরিয়া আসিয়া শ্যামসুন্দর যাহা মিলাইয়া দেন, তাহাই জলযোগ করা যাইবে।"

তখন পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে; আকাশের চাঁদ দুই হাতে তৃষিত তাপিত নরনারীর মস্তকে অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন। চারিদিকে প্রকৃতি নিস্তব্ধ! সমস্ত সহর যেন পবিত্র জ্যোৎস্নার ধারায় অভিষিক্ত হইতেছে। এমনই সময়ে বাবাজির সহিত আমি ব্রজের পথে বাহির হইলাম। বাবাজির গমনের ধরণ দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি কোন বিশেষ স্থানের কথা মনে করিয়া বাহির হন নাই। আমাকে যে কি দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গেই চলিতে লাগিলাম।

কিছু দূর যাইয়াই একটি পরিত্যক্ত মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সেখানে লোক-সমাগম নাই। বাবাজি সেই ভগ্ন পরিত্যক্ত মন্দিরের সোপানে উপবেশন করিলেন এবং ইঙ্গিতে আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম; একটি কথাও বলিলাম না।

তিনি তখন আপন মনে, আপনার ভাবে মত্ত হইয়া প্রথমে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বর স্পষ্ট হইল। এতদিন পরেও বাবাজির সে গানটি আমার মনে আছে; সেই রাত্রির দৃশ্য এখনও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বাবাজি সুকণ্ঠ; তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গাহিতে লাগিলেন—

জা লাগি চাঁদন বিথ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগি রে।
জা লাগি দখিন পবন ভেল সায়ক
মদন বৈরী জা লাগি রে।

সে কাহ্নু কতে দিনে পাহুন
হসি ন নিহারসি তাহি রে।
হৃদয়ক হার হঠে টারহ জনু
পেম সুধা অবগাহি রে।

রোয়াইতে মোরে আতুর ভেল লোচন
রয়নি জাম জুগে গেলি রে।
ফুজল চিকুর চীর নহি চেতএ
হার ভার তনু ভেল রে।

তপ তোর তরুণ করুণে কাহ্নু আএল
কাঁই বঢ়া বসি মান রে।
জেও ন অছল মন সেও ভেল সংপন
কবি বিদ্যাপতি ভনে রে।

গানের সকল কথা মূর্খ আমি বুঝিতে পারিলাম না ; তবুও বুঝিলাম, বাবাজি গাহিতেছেন—যার জন্য চন্দন বিষ হইল, যার জন্য চন্দ্র অগ্নি হইল, যার জন্য মলয় পবন শর হইল, যার জন্য মদন শত্রু হইল, সেই কানাই কত দিন পরে তোর ঘরে আসিয়াছে, সহাস্যমুখে তাহাকে দেখিস্ না ? তোর তপফলে কানাই আসিল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, যাহা মনেও ছিল না, তাহাও সম্পন্ন হইল। গানটা আমি এই রকমই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু বুঝিলাম না, বাবাজির কি হইল ? সত্য সত্যই কি এতদিন পরে তিনি তাঁহার প্রাণ-কানাইয়ের দর্শন লাভ করিলেন। বাবাজি এই গান গাহিতে লাগিলেন, আর তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। পাষাণ-হৃদয় আমি, অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, আর অতৃপ্ত হৃদয়ে এই গান শুনিতে লাগিলাম। বাবাজি তাঁহার শ্যামসুন্দরকে হৃদয়-আসনে বসাইয়া প্রেমানন্দে তন্ময় হইয়া গেলেন, আর আমি শূন্য-হৃদয়ে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। মাথার উপর চাঁদ হাসিতে লাগিল ; আমার মনে হইল, আমাকে যেন বলিতেছে—এই সম্বল লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছ ?

শ্রীজলধর সেন।

জীবন পণে

(কথা-নাট্য)

প্রথম দৃশ্য।

[হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশ, ঘন শালবন, দূরে দূরে ভূর্জ্জবৃক্ষ, মাঝে মাঝে বন্য ধুতুরার গাছ, কোথাও বা শ্বেতমল্লিকার সারি। গাছে গাছে লতায় পাতায় ঘন নিবিষ্ট, তাহার মধ্যে কুটীর। মাঝে মাঝে মেঘেরা কুটীরটিকে ঢাকিয়া দিতেছে। কুটীর-দ্বারে বসিয়া বাঁশুলিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে দূরস্থিত বাঁশঝাড়ের পাতার শব্দ ও বুলবুলের ডাক শোনা যাইতেছে। বাঁশুলিয়ার সর্ব্বাঙ্গে ছাইমাখা, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, মাথার চুলগুলি রুক্ষ, কপালের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে—হাওয়ায় মাঝে মাঝে সরিয়া পড়িতেছে। বাঁশুলিয়ার দীর্ঘ উন্নত সবল দেহ, চক্ষু সুন্দর পদ্মপলাশের মত ঢল ঢল বিস্তৃত। বাঁশুলিয়া একমনে বাঁশী বাজাইতেছে। বেলা অপরাহ্ন—শুষ্ক শালপাতা মাড়াইয়া রাজকুমারী মণিকার সখি কাঞ্চনার প্রবেশ। কাঞ্চনার কৃষক রমণীর বেশ।]

কা। বাঁশুলিয়া ! আমি এসেচি !

বাঁ। (অন্যমনস্কভাবে বাঁশীতে তান তুলিতেছিল)—

কা। মর্ মিন্‌সে, নিশ্চয় পাগল ! রাজকুমারীর যে কি বুদ্ধি তা জানিনে। বাঁশুলিয়া ! অ বাঁশুলিয়া ! এমন পাগলের তানে মানুষে মজে ?

[একটা হরিণ ছুটিয়া আসিয়া কুটীর-দ্বারে নয়ন তুলিয়া বাঁশীর সুর উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। বাঁশুলিয়াও তাহার বাঁশী পূর্ব্ববৎ ফুঁ দিয়া বাজাইতে লাগিল।]

কা। বাঁশুলিয়া! অ বাঁশুলিয়া!—মরণ দশা আর কি? মিন্‌সে কালা নাকি,—শুনতে পাওনা? অ বাঁশুলিয়া!

বাঁ। অ্যাঁ! অ্যাঁ! (বাঁশুলিয়ার মুখ লাল হইয়া গেল)—কে? কাঞ্চনা!

কা। আমি রাজকুমারীর কাছ থেকে এসেছি, রাজকুমারী মাথার দিব্য দিয়েছে, তোমাকে একবার দেখা করতে হবে।

বাঁ। কে? কাঞ্চনা? রাজকুমারী, কে? আমি ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কা। (স্বগতঃ) মিন্‌সে যেন ন্যাকা! (প্রকাশ্যে) রাজা শঙ্করজিতের কন্যা কুমারী মণিকা।

বাঁ। কাঞ্চনা! আমার অপরাধ ক্ষমা করতে ব'ল। আমি গরীব, চাষ করে খাই, রাজকুমারী জান্‌লে আমি তাঁকে আমার কুটীরে বাঁশীর গান শোনাতাম্ না। রাজকুমারী জান্‌লে আমি তাঁকে হৃদয়ের সে বুকভরা পুরোণো রাগিণী শোনাতাম্ না। আমার মর্ম্ম ভেঙ্গে গেছে কাঞ্চনা, আমার মর্ম্ম ভেঙ্গে গেছে। যাও যাও, রাজকন্যা, রাজার সখী তাঁরা আমার কুঁড়েতে কেন? আমি কোন রাজকুমারীকে চিনিনা, আমি শুধু একজনকে মণিকা বলে জানতাম্। সে ত ওই পাহাড়ের কেল্লার ধারে কি গ্রাম আছে, সেইখানে থাকে, এই জানি,—রাজকন্যাকে জানি না। মণিকা! মণিকা! সে ত সেই গাঁয়ের মণিকা!

কা। বাঁশুলিয়া, রাজকুমারীর বিবাহ! বুঝ্‌লে?

বাঁ। তা আমি চাষ করি, বাঁশী বাজাই, আমার কি—আমার কি—তাঁর বিয়েতে কি আমাকে বাঁশী বাজাবার জন্য ডেকেছেন? রাজকন্যার বিয়েতে আমি কেন? আমি কেন? বিয়েতে বাজাবার বাঁশী ত আমার নেই।

কা। শোন বাঁশুলিয়া, রাজকুমারী মণিকা তোমায় একটী কথা স্মরণ করে দিতে বলেছেন,—শ্রাবণ সন্ধ্যায় অরণ্যপথে দুর্জ্জয়

লিঙ্গের মন্দির হ'তে ফির্‌বার সময় ভল্লুকের মুখ হ'তে যাকে রক্ষা করেছিলে, যার প্রাণ আজ তোমারই দান, যাকে বুকে করে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ঝর্‌ঝর ধারায় ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে দুর্গতলে পৌঁছে দিছ্‌লে, তিনি তোমার কাছে আজ তাঁর ধর্ম্মরক্ষা করতে বলেছেন। আর বলেছেন, একদিন প্রাণরক্ষা করেছেন, আজ ধর্ম্মরক্ষা করুন। তিনি নারী, তিনি আর কি করতে পারেন? সবই পরবশে, আত্মবশে কেবল প্রাণ, তাও তাঁরি চরণে ফেলে দিয়েছেন। শুধু তাই দিতে পারেন তাঁকে।—বাঁশুলিয়া, নারী-ধর্ম্ম রক্ষা কর।

বাঁ। কাঞ্চনা! আমায় ক্ষমা কর। আমি জানতাম্ না যে, তিনি রাজা শঙ্করজিতের কন্যা, আমি জানতাম্ না যে রাজকন্যা এই দরিদ্রের জন্য কেন সে কথা এখনও মনে করে রেখেছেন, তাঁকে আমার কথা ভুলে যেতে ব'ল; বনপথে, পথ হারিয়েছিলেন, আমি বুন কাঠুরিয়া, আমি তাই—তা সে কথা আবার মনে রাখারাখি কেন?

কা। বাঁশুলিয়া! মনের ধর্ম্ম মনই জানে। নারী ভালবাসে, কেন ভালবাসে তা সে জানে না! বাঁশুলিয়া! এই যে হরিণী তোমার বাঁশীর স্বর শুনে উভরায় ধেয়ে এল, কেন বাঁশুলিয়া?—এই যে বুলবুল গাইছে, এই যে তোমার কুঁড়ের দ্বারের কাছে গোলাপ দুলে দুলে ফুটে উঠ্‌ছে, কেন বল ত? বাঁশুলিয়া! ওরা কি জানে কেন? ফুল কেন ফোটে বল্‌তে পার, বাঁশুলিয়া?

বাঁ। আমি ত ফুল নই, ফুলের ভাষা—কথা বল্‌ব কি ক'রে বল। আমি মানুষ, মানুষের কথা দুটো কইতে পারি। ফুল ফোটে কেন, তা আমি কি জানি। কাঞ্চনা, আগে জান্‌লে আমি তাঁকে গান শোনাতাম্ না; আগে জান্‌লে আমি তাঁকে—

কা। চুপ করলে কেন বাঁশুলিয়া, তাঁকে কি? বল—বল—

বাঁ। কিছু নয়, কাঞ্চনা, যাও, যাও, রাজকন্যার দূতী হ'য়ে আমার কাছে কেন? আমি—যাও, যাও, কিছু জানি না, আমি ওসব কিছু জানি না—দেখ আমি জানি ছেঁড়া কাপড়ে সারাদিন পরের ক্ষেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেট ভরাতে হয়। কেউ ডেকে কাজ দেয় ত কাজ করি, আজ কেউ ডাকে নি, আজ আর কাজ করতে যাই নি, আজ সারাদিনটা বাঁশীই বাজাচ্ছি। আমার কাছে এসব কথা কেন কাঞ্চনা—যাও, যাও, আমায় কেন তাঁর কথা শোনাতে এসেছ। রাজার বিয়েয় বাজাবার বাঁশী আমার নেই! আমি অনাথ, রাস্তায় পড়ে থাকতুম, গাছের পাতা ঘাস খেয়ে মানুষ হ'য়েছি। আজ একটা পাখী কি ফল মুখে করে এনে ফেলেছিল, তাই খেয়ে দিন কেটেছে। আমার কথায় রাজকুমারীর কি কাজ? কাঞ্চনা, যাও যাও, শীগ্‌গির যাও, আমি রাজকুমারীকে চিনি নি; যাও, যাও, ওসব কথা এখানে ব'ল না। ওই শোন বনদেবী জেগে উঠেছে —গোল ক'র না, যাও যাও—ওই দেখ এলা লতার মুকুট দুলে উঠ্‌ছে, সরে যাও, যাও!

কা। বাঁশুলিয়া! বাঁশুলিয়া! কি বল্‌ছ বাঁশুলিয়া? তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না যে, তোমার জন্যই শুধু রাজকুমারী মণিকা পরাণ ধরে রেখেছে,—পিতার ভর্ৎসনা, মাতার স্নেহের অভিমান, সখীদের টিট্‌কারী, এ সকল সহ্য করে শুধু তোমার মুখ চেয়ে আছে,—শুধু তোমার একটা কথায় আজ তাঁর বাঁচা মরা নির্ভর করছে,—নইলে হিমালয়ের মেয়ে মরতে ভয় পায় না। তুমি মানুষ না পাষাণস্তূপ বাঁশুলিয়া, পাষাণও বোধ করি ফেটে যায়, তুমি বেশ নিশ্চিন্ত উত্তর দিলে। না না, তুমি নিতান্ত কাপুরুষ, ধিক্ ধিক্! না হলে এই মুহূর্ত্তে এই অন্ধকারে দুর্ভেদ্য শালবন ভেদ করে তোমার প্রিয়তমাকে উদ্ধার করে আনতে। বাঁশুলিয়া! তোমায় শেষ কথা বলে যাই,

তুমি ধর্ম্মরক্ষা করলে না, কিন্তু নারী হিমালয়ের কন্যা, সে ধর্ম্ম রক্ষা করতে জানে। তুমি প্রাণ ভয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলে, নারী প্রাণের মায়া করে না, জেন, সে নিজেই সে ধর্ম্ম রক্ষা করবে। বাঁশুলিয়া! রাজকুমারীর কাল বিবাহ! (বাঁশুলিয়ার হাত হইতে বাঁশী পড়িয়া গেল) হায়! বাঁশুলিয়া, যদি বুঝ্‌তে নারীর প্রাণ! (স্বগতঃ) পুরুষের আঁখির পাতে কি আছে, যায় এমন হয়—উন্মাদ! তোমার সে বোধ-শক্তি লোপ হয়ে গেছে।

[কাঞ্চনা রাগভরে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া প্রস্থান করিল। দূরে নেপথ্যে গান গাহিয়া উঠিল।—

বাঁশীর তানে বনে এনে এখন কেন নিদয় হও,
এমন নিঠুর তুমি চরণতলে দলে যাও।—

একখানা মেঘ আসিয়া কুটীরকে ছাইয়া ফেলিল। বাঁশুলিয়া দূরে অচল মেরুর পানে চাহিয়া রহিল।]

বাঁ। (অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া)—বাঁশী—না আমি, বাঁশীই নিঠুর, সেই আমার মর্ম্ম ভেঙ্গেছে। বাঁশী? না আমি!

[হরিণটা তখন বাঁশুলিয়ার কাছে আসিয়া তাহার গায়ের কাছে মাথাটা ঘসিতে লাগিল। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ ঝঙ্কার করিতেছে— বাঁশুলিয়া বাঁশী লইয়া আবার বাজাইতে লাগিল—]

বাঁ। (হঠাৎ বাঁশী ফেলিয়া) না না কাঞ্চনা, তুমি ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, আমি কাপুরুষ—না না মণিকা, বাঁশুলিয়াও ধর্ম্ম রক্ষা করতে জানে—মণিকা! মণিকা! (বাঁশুলিয়া চঞ্চল চরণে এদিক ওদিক করিতে লাগিল) "তুমি ধর্ম্মরক্ষা করলে না, কিন্তু নারী ধর্ম্মরক্ষা করতে জানে।" (হাসিতে হাসিতে) হাহা-হাহা! নারী সকলই জানে, পুরুষে জানে না, সে অত মনের ধর্ম্ম ত বোঝে না—ঠিক—কাঞ্চনা! ঠিক ব'লে গেছ। আচ্ছা বাঁশুলিয়া! সে তোর কে? তোর ত এই

ছেঁড়া টেনা পরা, ঝরঝরে এই পাতার কুঁড়ে, তায় তুষার পড়্ছে ঝরে—মেঘের রাজ্যে বাস, আর ঘাস কেটে খাস্—সম্বল ত এই নিষ্ঠুর বাঁশী, যে কেবলই কাঁদে—চাঁদের আলোয় দেখা রাজকুমারীর হাসিতে চাহনিতে তোর এত কথা কেন? ফুল ফোটে, পাখী গায়, মেঘ আসে চলে যায়, চাঁদ উঠে জোছনা ঝরে, বাঁশ ঝাড়ে পাতা সর্ সর্ করে, তুই এই বাঁশী নিয়ে আছিস্ বাঁশী নিয়েই থাক্, যে যাবার সে যাক্, তোর এত কথা কেন? উঁহু না, এ বুকের ভেতর আবার যেন কেউ কথা কইছে, কি বল্ছে, ধর্ম্ম-রক্ষা! ধর্ম্মরক্ষা! মণিকা! মণিকা! রাজকুমারী মণিকা! না—না শুধু মণিকা, বুকের ভেতরে কে যেন জাগিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বল্ছে আমার মণিকা, ধর্ম্মরক্ষা! ধর্ম্মরক্ষা! বাঁশী! এতদিন কি সুরে কাঁদ্ছিলে, আজ আবার অন্ধকারে কার রূপ মনে পড়ে জেগে উঠ্লে বাঁশী—আজ যেন কি বেসুর ঠেক্ছে, সুরের দিশে ঠিক করেত পাচ্ছিনি—কোথায়! কোথায়! রূপ! রূপ! জীবন! জীবন! না না ধর্ম্মরক্ষা! একি সুরে বিশ্ব ভরে গেল, ধর্ম্মরক্ষা! হিমালয়ের কন্যার ধর্ম্মরক্ষা, নারীর ধর্ম্মরক্ষা—পুরুষের ধর্ম্মরক্ষা!

[বাঁশুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, হরিণটা সেই কুঁড়ের দ্বারের সম্মুখে শুইয়া পড়িল। পার্শ্বের সেই গোলাপ গাছ হইতে ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[হিমালয়ের বনদুর্গ—দুর্গাধিপ শঙ্করজিতের একমাত্র কন্যা মণিকা, দুর্গ-প্রাকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি হাত অলিন্দের উপর, আর একটি হাত গালে দিয়া, দূরে সূর্য্যাস্তের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন—সম্মুখে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিরাট পাষাণ ও ধবলাগিরির অভ্রভেদী শীর্ষ তুষারে মণ্ডিত, স্বর্ণাভা-অঙ্কিত। একদিকে বনদুর্গ—শাল, তমাল, পিয়াল ও ভূর্জ্জবৃক্ষের ছায়ায় ঢাকা, দূরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। অন্যদিকে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিকণা পর্ব্বত শিখরে ঠিক্‌রিতেছে—সন্ধ্যাসূর্য্য রক্তময়। মণিকার অঞ্চল বাতাসে উড়িতেছে, পার্শ্বে একটি গোলাপ গাছে গোলাপফুল বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া, মণিকার কপোলের কাছে আসিয়া পড়িতেছে; মণিকা সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক, হুঁস নাই। দুর্গ-প্রাকারের নিম্নদেশ দিয়া পার্ব্বত্যপথে কৃষক রমণীগণ গ্রাম্য গান গাহিতে গাহিতে পৃষ্ঠে সন্তান ও শিরে বোঝা লইয়া চলিয়াছে—]

ঘরে ঘরে আছে আমার সেই মুখ,
আমার বড় দুখে সুখ,
খাটি সারাবেলা হেসে পড়ি ঢলে
হাসি বড় করে মুখ,—
আমার বড় দুখে সুখ।
মেঘের আঁচল দিয়ে ঘেরা
আমার কুঁড়ে ঘর,
সেথা পাগলা ঝোরা পাগল পারা
পড়্ছে ঝরর্ ঝর।
সেই শালের ছায়ায় জড়িয়ে লতা
বাঁধা সুখের ঘর—
আমার মনের মত দুখ,
আমার বড় দুখে সুখ।

ম। সন্ধ্যা নেমে এল, বুকের ভিতর যেন আঁধার গুমরে উঠ্ছে—একি মেঘের ঘটা, এত মেঘ পাহাড়ে আসে কৈ এত কাল' মেঘ ত কখন দেখিনি, সে বিদ্যুৎ ও বজ্রপতনের দিনেও ত নয়! কোথা তুমি প্রাণাধিক! এ অন্তরে যে দীপখানি জ্বেলেছ, কৈ, বুঝি এ ঝঞ্ঝায় তা নিভে যায়, কোথা তুমি অন্তরতম! ইচ্ছা হচ্ছে ঐ ফিঙের মতন গাইতে গাইতে উড়ে যাই—

ঐ কেমন ঘুঘু দুটি পাতার আড়ালে মুখোমুখী করে ব'সে আছে, এ মেঘের অন্ধকারে তাদের কোন ভয়ই নেই—ঐ যে ওরা কেমন গাইতে গাইতে চলেছে—প্রাণাধিক! প্রাণাধিক! এ প্রাণ যে তোমারই শরণ নিয়েছে, কেমন করে, কেমন করে ধর্ম্মরক্ষা হবে বল—

[কৃষক রমণীরা তখন গাইতে লাগিল,—

"আমার মনের মত দুখ

আমার বড় দুখে সুখ"—]

আহা! ওরা সব কেমন গাইছে, আমার বড় দুখে সুখ—কৈ তুমি, আমার প্রাণের সুন্দর! কি বাঁশীই বাজায়েছিলে, বাঁশুলিয়া! তুমিই আমার বড় দুখে সুখ। (একটা নিশাচর টিট্টিভ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল—মণিকা চমকাইয়া উঠিল)— কাঞ্চনা এখনও এল না কেন, ওদের ভেতর কাঞ্চনাকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে কি সে যেতে পার্‌লে না, কেন আমি ত তাকে ওদের মত কাপড় প'রে দুর্গ হ'তে বার হ'তে দেখেছি—কি জানি, যদি দেখা না হয়, তিনি হয় ত কি মনে কর্‌ছেন, যদি কথা না কয়ে ফিরিয়ে দেন—তিনি হয় ত কি ভাবছেন, আমিই বুঝি ভুল কর্‌ছি—

কা। (গান গাহিতে গাহিতে নেপথ্যে—)

বাঁশীর তানে বনে এনে এখন কেন নিদয় হও,
এমন নিঠুর তুমি চরণ তলে দলে যাও।
বাঁশী তব কি গুণ জানে
আমি উতলা, সকল হেলা—
ধাই তোমা পানে,
তবু বল ফিরে যেতে, কেবা জানে কিবা চাও।

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনারই গলা—"কেবা জানে কিবা চাও"— সত্যিই কে জানে কি যে চাই—

(কাঞ্চনার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ—)

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনা! গান রাখ্, কি উপায় হ'ল, এই এলি? তাঁকে বলেছিলি, বলেছিলি? আমি নারী কি কর্‌তে পারি, পারি শুধু এই প্রাণ দিতে, বলেছিলি; চুপ করে রইলি কেন, দেখা হয় নি? বল্, বল্ তোর পায়ে পড়ি কাঞ্চনা, অন্ধকার গুহার মত অন্ধ হয়ে আছি, বুকের ভেতর আঁধার জমাট্ বেঁধে আস্‌ছে, বুঝি শ্বাস আর পড়ে না। দেখা হ'য়েছিল, কাঞ্চনা! কাঞ্চনা!

কা। দাঁড়াও বাপু, হ্যাঁ, আমার পায়ে কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেল, আমি এখন মর্‌ছি আপনার জ্বালায়—

মণি। তা হোক্, দেখা হয়েছিল কি'না বল্, বল্ তোর পায়ে ধরি বল্—

কা। রস' বাপু, উহু, উঃ—বাবা!—হয়েছিল দেখা! রস'—হ্যাঁ!

মণি। হয়েছিল তবে, তারপর, তারপর তবে, তারপর বলেছিলি?

কা। সখি! সে কথা শোন্‌বার তোমার প্রয়োজন? সে কথা না শোনাই ভাল। উহুঃ মাগো পা'টা জ্বলে গেল, সে কি হেথায় গা!

মণি। কাঞ্চনা! তুই রাক্ষসী। বল্ বল্—তুই কি বুঝেও বুঝ্‌বি নি!

কা। সখি! বুঝি, বুঝি সে কথা না কওয়াই ভাল, বুঝি ভুল্‌তে পার্‌লেই সুখ, বুঝি না পাঠালে আরো ভাল হ'ত, কেন পাঠিয়েছিলে সখি! সে ত পাগল—

মণি। না কাঞ্চনা, তা ভোলবার যে নয়। কাঞ্চনা, সে আমার পাগল, তার উপরে রাগ করিস্ নি। কাঞ্চনা, সবই আমার অদৃষ্ট, কাঞ্চনা! আমি কেন অম্‌নি ভিখারীর ঘরে জন্মালাম না, আমি কেন অম্‌নি ঘাস কি পাতা খেয়ে মানুষ হলাম্ না! না কাঞ্চনা! সে আমার জন্য পাগল! তিনি কি বল্‌লেন কাঞ্চনা, তুই সকল কথা তাঁকে জানিয়েছিলি?

কা। সখি! বিধি ভুল করে ফেলেছে সখি, তাই তোমায় এই রাজার ঘরে পাঠিয়েছে। তোমার পাগল কি বলে জান? বলে, আমি কাকেও চিনি নি, রাজকুমারী আবার কে? আমাকে দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিলে। বলে, চাষার আবার রাজকুমারীর সঙ্গে কি কাজ?

ম। কাঞ্চনা! সে অভিমান করেছে, সে অভিমান করেছে কাঞ্চনা! আমি প্রাণ ধরে তার ভাব বুকে করে বেড়াচ্ছি, কাঞ্চনা সে অভিমান করেছে, সে অভিমান করেছে, সে যে আমা-বই আর কাকেও জানে না কাঞ্চনা, তাই সে অভিমান করেছে।

কা। না গো না, সে রাজকুমারী মণিকাকে চেনে না। সে জানে ঐ পাহাড়ের তলায় গাঁয়ের একটা মেয়ে, তাকেই সে গান শুনিয়েছিল, রাজকুমারী জানলে তাকে কখন বাঁশী শোনাত না। সে গরীব, পাতার কুঁড়েয় বাস করে। তায় দিবারাত্র তুষার পড়ে। বলে, রাজকুমারীতে আমার কি কাজ?

ম। কাঞ্চনা! আমি বুঝেছি কাঞ্চনা! রাজকুমারী একটা, মণিকা আর একটা কাঞ্চনা! সে ত আস্‌বে না কাঞ্চনা—তবে কি উপায় হবে কাঞ্চনা? অন্ধকার ঘনিয়ে গাঢ় হয়ে এল, কাঞ্চনা! এত অন্ধকার কখন দেখেছিস্? ওদিকে তুষার পড়্‌ছে। কাঞ্চনা, আমি একলা যাব, না কাঞ্চনা আমিই যাব। সে অভিমান করেছে কাঞ্চনা, আমিই যাব। রাজকুমারী ব'লে সে অভিমান করেছে, আমিই যাব। আর ত আমি রাজকুমারী নই কাঞ্চনা! বড় অন্ধকার, সেই শালবনের ভিতর দিয়ে কেমন করে—চারিদিকে দুর্গে যে সতর্ক পাহারা, না আমিই যাব,—আমিও ঐ কৃষক রমণীর বেশে যাব, আর ত আমি রাজকুমারী নই সখি! যাব আমিই যাব —শুনতে পাচ্ছিস্ নি, ঐ যে বাঁশী ডাক্‌ছে—আমিই যাব।

[দুর্গ-প্রাকারের একধারে রাজা শঙ্করজিৎ কোষবদ্ধ তরবারিতে

হস্ত দিয়া দাঁড়াইয়া—পার্শ্বে রাণী হৈমবতী দুই হাত বক্ষে চাপিয়া—উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, ক্রোধে তাঁহার স্ফুরিত অধর দংশন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া মণিকার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—]

শ। রাজকুমারী মণিকা! এ দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য অন্ধকারে তুষার-নিসিক্ত প্রস্তরকঙ্করময় বনপথে কার অভিসারে—কোথায় যেতে হবে? রাজকুমারী মণিকা! কৃষক রমণী হবার এতই সাধ, সে ছিন্নবস্ত্র মলিন রুক্ষকেশ বন্য বর্ব্বর ভিখারী পথের কুক্কুর পরান্ন উচ্ছিষ্টভোজী আশ্রয়হীনের আশ্রয় কি এতই প্রার্থনীয় ও মধুর?

ম। পিতা! এ বিস্তৃত আকাশতলে হিমালয় কাকেও আশ্রয়-হীন করেন না!

শ। চুপ্! কে তোর পিতা? পাপিয়সি! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলি, নারীধর্ম্মে ভস্ম লেপিলি, গৌরীশঙ্কর সম আমার এ বিজয় গরিমার তুঙ্গ শৃঙ্গ ধূলায় লুটালি? সেই ঘৃণিত লজ্জাহীনটা তোর আশ্রয়স্থল হ'ল? আরে, আরে—

ম। পিতা! স্বামী নিন্দা নারীর শুনতে নিষেধ!

শ। কি—কি—স্বামী? চুপ, নিজমুখে ও পাপ কথা উচ্চারণ কর্‌লি? তোর জিহ্বা শতধা হ'ল না? রাণী! এই তোমার গর্ভজাত কন্যা—যে আত্মমর্য্যাদা জানে না?

হৈম। মহারাজ! আমার কন্যা আমারই উপযুক্তা! মহারাজ! স্বামী-নিন্দা শুনতে নারীর নিষেধ—একথা ত সত্যই মহারাজ! মহারাজ! এই হিমালয়ই সে সত্যের অক্ষুণ্ণ ধারা গঙ্গা, নন্দা, সরযূ, গোমতী, তিস্তা যুগ যুগ ধরে নিয়ে চলেছে। মহারাজ! ঐ বিরাট গৌরীশঙ্করও তাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সে কথা ত মিথ্যা নয় মহারাজ! আমার গর্ভজাত কন্যা আত্মমর্য্যাদা ভুলে নি রাজন্!

শ। বটে, বটে, ভুল হয়ে গেছে রাণী! বুঝ্‌তে ভুল হয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলাম, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার ত সব কাহিনীই স্মৃতিতে লেখা থাকে দেখ্‌ছি! তুমি কি বল্‌তে চাও যে দীনহীন কপর্দ্দকশূন্য নিঃস্ব অন্নমুষ্টির ভিখারী, পথে পথে ঘাস পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে, সেই হত-ভাগ্য ঘৃণিত কুক্কুরেরও অধম—(মণিকা দুই হাত কর্ণে চাপা দিল)—তার করে আমি শঙ্করজিৎ দক্ষ প্রজাপতির বংশধর, আমার ঔরসজাত কন্যাকে—রাণী! রাণী! আমার মস্তিষ্কে বজ্রের দাহন জ্বালা—অজিৎ! অজিৎ! প্রহরী, ডাক অজিৎকে —আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমারই কন্যা আজ আমারই ভাগ্যের নিয়ন্তা হোল, ধিক্!

[রাজা শঙ্করজিৎ সেইখানে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। এক-বার কোষবদ্ধ তরবারির উপর হাত দিয়া, মণিকার মুখের দিকে চাহিলেন, আবার ঊর্দ্ধে আকাশপানে চাহিয়া চঞ্চলভাবে বেড়া-ইতে বেড়াইতে কহিলেন, "নারায়ণ!"—মণিকা ও কাঞ্চনা মুখ নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। রাণী হৈমবতী অঞ্চলে নয়নজল মুছিতে লাগিলেন।]

শ। নারায়ণ! নারায়ণ! হিমালয়! তুমি জান আমার বংশের গরিমা। হিমালয়! আজ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে—হো! হো! কি তাপ!

[অজিৎ প্রবেশ করিলেন—শ্বেতচম্পকবর্ণাভা ফুটিয়া উঠিতেছে —বিশাল বক্ষ বর্ম্মে আচ্ছাদিত, শিরে উষ্ণীষ—কটীতে তরবারি।]

শ। অজিৎ! অজিৎ! শোন, এই মণিকা ও সখী কাঞ্চনাকে কারাগারে—

হৈম। মহারাজ! বালিকা, মার্জ্জনা করুন—

শ। চুপ্—বাধা দিও না—উত্থিত বজ্রের নীচে আপনাকে এন' না, যাও, সর—এই মণিকা ও সখী কাঞ্চনাকে কারাগারে

লয়ে যাও। আর মন্ত্রীকে আমার আদেশ জানাও যে, রাজ-কুমারী মণিকার কাল বিবাহ! তুমিও প্রস্তুত হও, ভবিষ্যৎ সিংহাসন তোমারই—একথা যেন তোমার স্মরণ থাকে, কাল প্রাতে তোমার অভিষেক—তোমাকে আজীবন পুত্রবৎ স্নেহে পালন করেছি, আশা করি রাজাদেশ পালন করবে।

অ। মহারাজ! জিজ্ঞাসা করতে পারি—অপরাধ?

শ। আমার ইচ্ছা,—যাও, যাও আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও— জিজ্ঞাসা ক'র না—মনে হয় এ বিশ্ব কেন গুঁড়া হয়ে যাক্ না? যাও নিয়ে যাও—

অ। আসুন রাজকুমারী! সখী কাঞ্চনা সঙ্গে এস—

ম। মা গো—

[মণিকা ও কাঞ্চনা অজিতের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।]

হৈ। মহারাজ! আমার বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা—

শ। রাণী হৈমবতী! তোমার ত সকল কাহিনীই মনে থাকে, আমার বংশের কাহিনীও তোমার মনে রাখা উচিত ছিল। আমিও এই হিমালয়ে দক্ষপ্রজাপতির বংশধর, সে কথাটাও তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।

হৈ। মহারাজ! কন্যা আমার নিতান্ত বালিকা মাত্র, মহারাজেরও স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, দক্ষের যজ্ঞও এই একই কারণে ধ্বংস হয়েছিল—মহারাজ! আমার কন্যাকে মার্জ্জনা করুন! (শঙ্করজিতের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন) কন্যা আমার বালিকা মাত্র!

শ। (পা দিয়া ঠেলিয়া) রাজ্ঞী! আশ্বস্তা হও! (হাসিয়া) এ সমস্ত হিমালয়ে এমন কেউ নাই যে আমার এ যজ্ঞ ধ্বংস করে। আমার বংশের সম্মান, আমার বংশের সম্মান, আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। যাও, যাও, সর—এই বৃদ্ধ বয়সে ভেবে-ছিলাম মণিকার উপযুক্ত পাত্র অজিতের করে তাকে সমর্পণ

করে গভীর অরণ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করব। রাণী! আমার মস্তিষ্কে বজ্রের জ্বালা জ্বলছে। যাও, যাও, জানি আমি রমণীর অশ্রুজলই বল। হিমালয়! তুমি জান এ মরমের কথা। রাণী হৈমবতী! দ্বাদশ বর্ষ তপশ্চর্য্য করে এই মণিকা কন্যা লাভ করেছিলে রাণী! শঙ্কর আমার বক্ষে বড় শক্ত হৃদ-পিণ্ড দিয়েছেন, না হ'লে এতক্ষণ দ্বিধা হয়ে যেত।

[রাজা শঙ্করজিৎ ঊর্দ্ধে অন্ধকার পানে তাকাইতে তাকাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন—রাণী! হৈমবতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন মেঘ ঘনাইয়া আসিল, মুষলধারে বৃষ্টি, বজ্রপতনের শব্দ ও করকাবর্ষণ হইতে লাগিল।]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রাত্রি অন্ধকার—পার্ব্বত্য দুর্গের অভ্যন্তর; অন্ধকার অন্তঃপুর-কারাগার, একপার্শ্বে জানালা—জানালার ধারে মণিকা দাঁড়াইয়া—পর্ব্বতের অপর পার্শ্ব হইতে চাঁদ উঠিল—চন্দ্রালোক তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে—সিক্ত নয়নপল্লব জলে ভরা—চাঁদের পানে চাহিয়া—জানালার পার্শ্বে দেয়ালের ধার দিয়া অজিৎ আসিতেছিলেন—মণিকার কথা শুনিয়া দাঁড়াইলেন।]

ম। হে চন্দ্রমা! তুমি ত সব জান; তুমি, সেই অন্ধকার বন-পথে এমনি অকস্মাৎ পর্ব্বতের ফাঁক হতে উঁকি মার্‌লে—সেই চন্দ্রালোকে দুজনের দেখা, সেই ভীষণ ভল্লুকের হাতে—সেই ভয়াল বন্যপশুকে রিক্ত হস্তে কেমন ক'রে নিহত ক'রে—সেই কপাটবক্ষ দৃঢ় উন্নতশীর্ষ পুরুষ,—তারপর তুমি কোথায় লুকালে, শ্রাবণ মেঘে ঝর্ঝর্ ধারা বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। আহা প্রাণাধিক! আমায় বক্ষে ধরে দুর্গমধ্যে রেখে গেল—চন্দ্রমা! তুমিও মেঘের আড়ালে থেকে সবই দেখেছিলে—তুমি দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ দেখেছিলে, তুমি এই

হিমালয়ে আবার কি তাই দেখ্‌তে চাও, চন্দ্রমা? তুমি ত কত যুগের কত হাসি, কত কান্না—

[অজিৎ ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে সম্মুখে আসিয়া]

অ। রাজকুমারী!

ম। (নিরুত্তরে নিশ্বাস ফেলিলেন)—(স্বগতঃ) আঃ—সর্প কেন দংশিল না শিরে—

অ। রাজকুমারী! আপনাকে দুটো কথা শুধু বল্‌তে এসেছি—রাজকুমারী! আমি আপনার প্রণয়-পাত্রকে মিলন করাইয়া দিব, রাজকুমারী! বোধ হয় জানেন অজিৎসিংহ কখন মিথ্যা কথা বলে না; বালককাল হ'তে এক সঙ্গে খেলা, একসাথে মৃগয়া, একসাথে পর্ব্বতে পর্ব্বতে নন্দা তিস্তার উৎপত্তি-স্থান খুঁজিতে যাওয়া, একসাথে অনেকদিন কেটেছে—রাজ-কুমারী আমাকে তাঁর সহোদর ভায়ের মত মনে কর্‌বেন বোধ হয়।

ম। অজিৎ ভাই! (রাজকুমারী মণিকা কাঁদিয়া ফেলিলেন)—আমি আর রাজকুমারী নই!

অ। রাজকুমারী! আপনি আশ্বস্তা হ'ন,—কল্য বিবাহরাত্রে আমি প্রাণ দিয়েও আপনার প্রণয়-পাত্রকে মিলন করাইয়া দিব—শুধু এই কথা বল্‌তে, শুধু এইটুকু জানাতে এয়েছি;—আর—না থাক্—

[অজিৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন।]

ম। ভাই! ভাই! বুঝেছি বুঝেছি—প্রেম সর্ব্বত্যাগী, অজিৎসিংহ বুঝেছি—হায়! কেন এই নারীজন্ম!—আহা! আমার সে পাগল এখন কোথায়, এখন সে কি কর্‌ছে?—বাঁশুলিয়া! বাঁশুলিয়া! কৈ সে তোমার বংশীধ্বনি—পাগল! পাগল! তুমি আমার হৃদয়ে কি বাঁশী বাজালে বল, কি রন্ধ্রে আমার এ হৃদয়ে আঘাত করলে, যায় সমস্ত তুষার গলে গেল,

পাগল! বাঁশুলিয়া! বাঁশুলিয়া! তুমি কি জান যে তোমার শালবনের বুন পাখী আজ কোন লোহার খাঁচায় আবদ্ধ হয়েছে?

চতুর্থ দৃশ্য।

[বিবাহরাত্রি—অচলমেরুর চারিদিকে আলোকমালা পর্ব্বতে পর্ব্বতে বাদ্য ও শঙ্খের রোল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—বিবাহ-মণ্ডপে সালঙ্কারা রাজকুমারী মণিকা, পার্শ্বে সখী কাঞ্চনা, সম্মুখে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন—সম্মুখে হোমাগ্নি। একপার্শ্বে বসিয়া রাজা শঙ্করজিৎ—দূরে রাণী হৈমবতী ঘোড়হস্তে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া—চারিদিকে প্রহরীবর্গ,—নিমন্ত্রিত আত্মীয়বর্গ সকলে উপবিষ্ট, কেহ হাসিতেছেন, কেহ কথা কহিতেছেন। পুরোহিতের পার্শ্বে শ্রুতিপাঠ হইতেছে।]

শ। রাণি! শুভকার্য্যে অশ্রুজল ফেল না,—রাণী হৈমবতী! তুমি কি আমার বংশ-গরিমার ভাতি ভুলে গেছ? কেন, তোমার ত সকল কাহিনীই মনে থাকে।

পু। (হোমাগ্নিতে হব্যদান করিলে অগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল) মহারাজ! আহুতি গ্রহণ করুন—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—

[নেপথ্যে বাঁশুলিয়ার বংশী বাজিয়া উঠিল—]

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনা! (উন্মত্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া) ঐ বাঁশী বেজেছে, তিনি আস্‌ছেন, তিনি আস্‌ছেন, কাঞ্চনা! কাঞ্চনা!

কা। বস বস—(মণিকা আবার বসিয়া পড়িলেন)

শ। ওকি! ওকি! হ্যাঁ, এই যে—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—

পু। কৈ বর কোথায়—বরকে আনয়ন করুন,

শ। অজিৎ! অজিৎ! কৈ মন্ত্রি! অজিৎকে শীঘ্র আনয়ন করুন, লগ্ন অতিবাহিত হয়ে যায়! ওকি! কৈ অজিৎ কোথায়?

[মন্ত্রী ছুটিয়া অজিৎকে ডাকিতে গেলেন—নেপথ্যে হর হর

শব্দ ও অশ্বের পদধ্বনিতে পার্ব্বত্য দুর্গ কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল।]

শ। কি! কি! কিসের গোলমাল! আরে! আরে! ভীরু সব—

[বাঁশুলিয়া ও বারজন পাহাড়িয়া অশ্বোপরি সশস্ত্রে প্রবেশ করিল—মুখে মার্—মার্—মার্—হর হর রব)—বাঁশুলিয়া বামহস্তে মণিকাকে ঘোড়ার উপর তুলিয়া লইল।]

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনা! একি স্বপ্ন না বিভ্রম!

বাঁ। শোন, সকলে শোন, এই রাজকুমারী মণিকা আমার ধর্ম্ম-পত্নী, আমি বাঁশুলিয়া তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি—চন্দ্র সূর্য্য হিমালয় ও আমার আত্মা সাক্ষী। আমি এই সকলের মধ্যে থেকে তাঁকে গ্রহণ করলাম, যদি কাহারও সাধ্য থাকে সে যেন বাধা দেয়। দ্বিতীয় দক্ষপ্রজাপতি! আমিই তোমার যজ্ঞ ধ্বংস করলাম্—

[ইতিমধ্যে পাহাড়িয়াগণের সহিত রাজা শঙ্করজিতের প্রহরীবর্গ ও অন্যান্য পুরবাসীগণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল।]

শ। আরে রে বর্ব্বর! হতভাগ্য হীন ক্রীতদাস, ভিক্ষান্নে দিন কাটে যার, বধি তোরে পশুর মতন! প্রহরি! প্রহরি! রুদ্ধ কর সকল দুয়ার, যেন মক্ষিকা না পলায় চকিতে। আরে, আরে! ঘৃণিত তস্কর, বধি তোরে ছাগ পশু সম।

[বাঁশুলিয়া মণিকাকে লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান,—রাজা শঙ্করজিৎ তার অনুধাবন করিলেন—]

হৈ। নারায়ণ! নারায়ণ! (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)—

[পাহাড়িয়ারাও যুদ্ধ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল—]

কা। সব ত বেশ হোল! এখন কাঞ্চনা তোকে ত কেউ চায় না? তুই তবে দাঁড়িয়ে কেন বল,—তোর ত কাজ ফুরল—এ

হোমাগ্নি কেন তবে আর শুধু জ্বলে—বাঁশুলিয়া! তুমি বেশ বাঁশী বাজিয়েছিলে—বাঃ!

[হোমাগ্নিতে ঝম্প প্রদান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

[চারিদিকে অন্ধকার—তিস্তা নদীর তীরের নিকট দুই পর্ব্বতের মধ্যদিয়া পথ; দ্রুতবেগে বাঁশুলিয়া সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে, মণিকাকে বক্ষে লইয়া ঘোড়ার উপর ছুটিয়া আসিতেছেন—]

বাঁ। মণিকা! মণিকা! ধর্ম্মরক্ষা হয়েছে, মণিকা! ধর্ম্মরক্ষা! ধর্ম্মরক্ষা!

ম। প্রিয়তম! প্রিয়তম!

বাঁ। বারটা পাহাড়িয়া মরে গেছে—তাদের সমস্ত বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে—বারটা প্রাণের মূল্যে তোমায় আজ লাভ করেছি মণিকা!

[পশ্চাতে রাজা শঙ্করজিৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছেন—]

শ। নিস্তার নেই! নিস্তার নেই! এখন নিস্তার নেই! সারা বিশ্বে তোর স্থান হবে না, নিস্তার নেই! আরে! আরে! কৃতঘ্ন পিশাচ, মৃত্যু শিরে তোর—

[বাঁশুলিয়ার ঘোড়া তুষারের উপর পা মচ্‌কাইয়া পড়িয়া গেল, বাঁশুলিয়াও মণিকাকে লইয়া তিস্তার তীরে ছিট্‌কাইয়া পড়িলেন—ঠিক সেই সময়ে শঙ্করজিৎ—"এইবার! এইবার! না না পতিত যে"— এই বলিয়া একবার থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন—পরমুহূর্ত্তেই মণিকা চকিতের মধ্যে বাঁশুলিয়ার তরবারি লইয়া শঙ্করজিতের গলে আঘাত করিলেন—তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া মণিকার কোলের কাছে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। ওদিকে তখন প্রভাত; পর্ব্বতের পৃষ্ঠ-দেশ হইতে অকস্মাৎ সূর্য্যোদয় হইল—মণিকা দেখিল—পিতা!]

ম। পিতা! পিতা!—সূর্য্য তুমি ত সব দেখ্‌লে।

[মণিকা মৃত বাঁশুলিয়াকে বক্ষে তুলিয়া তিস্তার জলে নামিতে লাগিল।—ছুটিতে ছুটিতে অজিতের প্রবেশ—]

অ। পিতা! পিতা! মহারাজ! রাজকুমারী!

ম। (জলে নামিতে নামিতে) অজিৎ ভাই! ক্ষমা কর, আমি জীবন পণে প্রেম ক্রয় করেছি; ঐ দেখ তিস্তা আমাদের হাত বাড়িয়ে ডাক্‌ছে, বল্‌ছে বেশ করেছিস্।

অ। বেশ করেছ রাজকুমারী! আমিও জীবন দিয়ে সে প্রেম বিক্রয় করলাম, তাও তবে দেখে যাও—(অজিত নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন ও পড়িয়া গেলেন।)

ম। হিমালয়! হিমালয়! তোমার কন্যা! হিমালয় তুমি রইলে, যুগ যুগান্ত রইলে; এই কাজের সাক্ষী রইলে।

[মণিকা বাঁশুলিয়াকে বুকে লইয়া ডুবিয়া গেল—তিস্তার উপরে যে তুষার ভাসিতেছিল তাহা আবার সমান হইয়া গেল—চারিদিকে পাখীরা কলরব করিয়া উঠিল—] দূরে কৃষক রমণীরা গান গাইতে গাইতে মাঠের দিকে চলিয়াছে—

ভোরের বেলা পাখী গায়
সোনার আলো লুটায় পায়
ভুট্টা ক্ষেতে হাওয়া চলে
চল্‌লো কাজে চল্।
মনের মানুষ মনে আছে
ভাবনা কিসের বল্।

(যবনিকা পতন।)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

অন্তর্যামী

(১)

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!
অপূর্ব্ব আলোকভরা, অন্ধকারে ঢাকা;
শত লক্ষ চূড়া তার, আনন্দ গম্ভীর,
উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্ন-পটে আঁকা!
নাহি বৃক্ষ, তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া;
শত লক্ষ পুষ্পলতা অপূর্ব্ব বরণ,
পাকে পাকে উঠিতেছে ঘিরিয়া ঘিরিয়া!
উজ্জ্বল স্বপনভরা, আনন্দ গম্ভীর,
ওই ছায়ালোকে ভাসে অপূর্ব্ব মন্দির!

(২)

নাহি মেঘ তবু যেন ছুটাছুটি করে,
অপূর্ব্ব আলোক ছায়া, মেঘেরি মতন!
নাহি চন্দ্র, নাহি সূর্য্য! কি যে স্বপ্নভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন গগন!
নাহি শব্দ, তবু যেন নীরব গম্ভীর
উঠিতেছে নিরন্তর কার গীত ধার?
প্রশান্ত আনন্দভরা ধীর, অতি ধীর,
কে যেন বন্দনা করে কোন দেবতার!
বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা, আনন্দ গম্ভীর,
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!

(৩)

ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার?
কোন পথে যেতে হবে,
কে বল আমারে কবে,
যেন হেরি মনে মনে বদ্ধ চারিধার?
ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার?

কঠিন পাষাণে যেন রুদ্ধ চারিধার!
প্রবেশের পথ নাই,
যতই যাইতে চাই,
তবু আশা নাহি ছাড়ে অন্তর আমার!
ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার!

(৪)

যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে মোর!
আমার অন্তর-আত্মা বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে,
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে!
কেন হাসিতেছ তুমি, নির্ম্মম নিষ্ঠুর!
অজানিত পথ কিগো, এতই বন্ধুর?
যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে মোর,
যেমন করেই হোক যেতে হবে মোর!
পথ খানি যেথা থাক, পাব আমি পাব,—
যেমন করেই হোক যাব, আমি যাব!

(৫)

পথ খানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায় ;
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায় !
কোথা পথ, কোথা পথ, কোথা পথ খানি !
সে পথ বিহনে যে গো, সব মিছা মানি !
এদিকে ওদিকে চাই, চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই, পথের সন্ধানে !
এই পথ দেখি ভাবি, পেয়েছি পেয়েছি !
এ পথ সে পথ নয়, এ পথে এসেছি !
নিশ্বাস ফেলিয়া চলি, কত দূর জানি,
এই গ্রাম-প্রান্ত হ'তে সেই পথ খানি !

৫। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

২। কোথা হইতে আসিল ?

পূর্ব্বের "নারায়ণে" বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। বঙ্গবগধচের জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম লইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি ঠিক হউক আর নাই হউক, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মতামত আচার-ব্যবহার অনেকটা পূর্ব্বদিক হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বঙ্গবগধচের জাতির কথা অল্প লোকেই জানে। অতি অল্পদিন হইল ঐতরেয় আরণ্যকের একটি ব্রাহ্মণে উহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে। এখনও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন ওখানটার অর্থবোধই হয় না। সায়ন বঙ্গবগধচের শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তবে ওকথার উপর জোর দেওয়া যায় কি ? সায়নের কথা ধরি না ; সায়ন বেদরচনার দুই তিন হাজার বৎসর পরে উহার অর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। দু'চারটা মানুষের নাম ও দেশের নামের তিনি যে অন্য অর্থ করিয়া দিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এস্থলে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা নিজেও ইহার অর্থ কি স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে বেশ দেখিতে পাইতেছি যে বঙ্গশব্দের মানেতে কোনও গোল নাই। সায়নের অর্থ বনংগতা, এ অর্থ আমরা লইতে পারি না। বগধ যে মগধ তাহাতেও আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। তামিল জাতির একটা শাখাকে যে চের বলিত তাহারও সন্দেহ নাই। এখনও দক্ষিণ দেশে তামিল বা দ্রাবিড়িয় জাতির মধ্যে কেরল নামে একটি প্রবল জাতি আছে। কেরলদিগের প্রাচীন নাম চের। চেরো বলিয়া একটি জাতিকে ছোটনাগপুরের সমস্ত

ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ বগধ ও চের জাতি।

জাতিই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। কপিলবাস্তুর নিকটে এখনও যে খাড়ু জাতি আছে তাহারাও চেরো বা চেরজাতির একটা ধারা।

এই সকলের সঙ্গে যদি আর একটা কথা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরও একটু সুবিধা হয়। সকলেই জানেন যে আরণ্যক-গুলি ব্রাহ্মণগুলিরই শেষ অংশ। ব্রাহ্মণ যে প্রকারের বই, আরণ্যকও সেই প্রকারেরই বই। ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, আরণ্যকে তাহাই বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ অংশে ইন্দ্র-দেবতার মন্ত্রে অভিষেক হওয়ায় যেসকল রাজা বড় হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যে ঋষি অভিষেকের পুরোহিত ছিলেন তাঁহার প্রশংসা আছে, আর যে রাজা অভিষেক লইয়াছিলেন তিনি কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। এই তালিকার শেষ ভাগে লেখা আছে যে ভরতরাজা ইন্দ্র অভিষেক লইয়া ১৩৩টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭৮টা যমুনার পশ্চিমে মরুদ্ধ দেশে, আর ৫৫টা গঙ্গার পূর্ব্বে জলবৃষ্টির দেশে। যমুনার পশ্চিমে যতদূর যাইবে মরুদেশ আর উষ্ণ দেশ। কতদূর ভরতের অধিকার ছিল বলা যায় না। ৭৮ অশ্বমেধের জন্য কতখানি দেশ লওয়া আবশ্যক আমরা জানিনা। তবে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বেলুচিস্তান উহার মধ্যে ছিল না। থাকিলে ভরতের নাম অনুসারে উহাও ভারতবর্ষ বলিয়া গণ্য হইত; তবেই যমুনার পশ্চিম হইতে সিন্ধুদেশের পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া তিনি ৭৮টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। তাই যদি হইল তবে ৫৫টা অশ্বমেধের জন্য গঙ্গার পূর্ব্বে কতটা জমী তাহাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল? ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্তর্বেদীর নাম একেবারেই করে না, বলে যমুনার পশ্চিমে ও গঙ্গার পূর্ব্বে। এখন ৫৫ অশ্বমেধের জন্য কতটা দেশের দরকার। আমার বোধ হয়

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভরতের রাজত্ব।

এলাহাবাদ হইতে ঠিক উত্তরমুখে রেখা টানিলে ঐ রেখা ও গঙ্গার পূর্ব্বপারের মধ্যে যত দেশ পড়ে তাহাই ৫৫টা অশ্বমেধের পক্ষে যথেষ্ট।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভারতবর্ষ অথবা আর্য্যভূমির অথবা আর্য্যজাতির বসতি বিস্তারের এই সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে, তাহার পরই ঐতরেয় আরণ্যক বলিলেন যে বঙ্গ বগধ চের-জাতি পক্ষিবিশেষ; উহাদের ধর্ম্ম নাই, উহারা নরকগামী হইবে। ইহার মোটামোটি অর্থ এই হইল যে আর্য্যগণ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার ওদিকেই বঙ্গবগধচেরজাতি। ইহারা আর্য্যগণের শত্রু। আর্য্যগণের বসতি-বিস্তারে বাধা দিতেন তাই আর্য্যগণ ইহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। যাহাদিগকে তাহারা দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল। তামিল-গণ তাহাদের কাছে বানর। কর্ণাটগণ হয়ত ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষস। সেইরূপ বাঙ্গালার লোক পাখী।

বঙ্গবগধ ও চেরগণ পাখী।

বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখীর দেশেই জন্মান। তাঁহারও পূর্ব্বে কনকমুনি কপিলবাস্তুরই নিকটে জন্মাইয়া বোধি লাভ করেন। এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম্ম-প্রচারক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বৈশালী, পাটনার উত্তর-পশ্চিম গঙ্গার উত্তরপারে। ইনি আবার জৈনযতি হইয়া বার বৎসর কাল পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসেন। বৈশালীর লোক মনে করিল, মহাবীর নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বার বৎসর পরে তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া কেবলী হইয়া ফিরিলেন। তাঁহারও পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পরি-ত্যাগের পর পূর্ব্ব অঞ্চলে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া সমেতগিরি অর্থাৎ পরেশনাথ পাহাড়ে বাস করিয়া তথায়ই দেহরক্ষা করেন। আর আর তীর্থঙ্করদের অনেকেই পূর্ব্ব অঞ্চলের লোক। ২৪জন বুদ্ধ

বুদ্ধ পূর্ব্বাঞ্চলের লোক।

ও ২৪জন তীর্থঙ্করের বৃত্তান্ত পড়িলে একথা আরও প্রমাণ বলিয়া বোধ হইবে।

পশ্চিমাঞ্চলে যখন আর্য্যগণ যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল করিতে ব্যস্ত, শ্রৌতসূত্র রচনায় ব্যস্ত, শূদ্রগণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখার বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত, তখন পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গবগধচেরগণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত, কিসে জন্মজরামরণের হাত এড়ান যায় তাহাই লইয়া ব্যস্ত। পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ঋষির পর ঋষি শ্রৌতসূত্র রচনা করিতেছিলেন; পূর্ব্ব অঞ্চলে তেমনি তীর্থঙ্করের পর তীর্থঙ্কর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে সুখে থাকা যায় তাহারই উপায় দেখিতেছিলেন।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ভেদ।

শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ, মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর, দুজনেই এক সময়ের লোক। দুজনেই খৃষ্টের পূর্ব্বে ছয় শতের লোক। সুতরাং দীপঙ্কর প্রভৃতি ২৪জন বুদ্ধ আর ঋষভদেবাদি ২৪জন তীর্থঙ্কর তাহাদের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে শাক্যসিংহের পূর্ব্বে যে ২৩জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ নন—বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্ম্মটা পুরাণ, তাই দেখাইবার জন্যই ২৪টা নাম করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কনকমুনির থাম্বা পাওয়া গিয়াছে, যেখানে তাহার নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহা স্থির হইয়াছে; তাঁহাকে মানুষ নয় বলা এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এখনকার নেপালী বৌদ্ধেরা বলে চারিযুগে আটজন মানুষ বুদ্ধ। বিপশী ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও বিশ্বভূ ত্রেতাযুগে, ক্রকুচ্ছন্দ ও কনকমুনি দ্বাপরে, এবং শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয় কলিযুগে। অপর ১৭জনকে তাঁহারা মানুষ বলুন আর নাই বলুন, শাক্যমুনি ও তাঁহার পূর্ব্বেকার ছয়জনকে তাহারা মানুষ বলেন। তীর্থঙ্করদের মধ্যেও, অনেকে মনে করেন যে শেষ দুইজন মাত্র সত্যসত্য মানুষ, বাকীগুলি মনগড়া মাত্র। তাহা হইলেও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধ ও

২৪জন বুদ্ধ ও ২৪জন তীর্থঙ্কর।

মহাবীরের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে পরকাল লইয়া অনেকদিন হইতে নাড়াচাড়া হইতেছিল।

বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথা আজীবক—ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম্ম, নিগ্রন্থ—ইহা মহাবীরের ধর্ম্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, অজিতকেবশ কম্বল একজন, সঞ্জয় একজন ও পোকুদ কত্যায়ণ একজন।

এগুলিও ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেইখানেই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে লোক যে কেবল ধর্ম্ম লইয়াই থাকিত, এরূপ নহে; এখানে অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ডাক্তার হর্‌নলি বলেন যে অস্ত্রচিকিৎসা পূর্ব্বাঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। হস্তিশাস্ত্র এই দেশেই রচনা হয়। ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও পূর্ব্বভারতে; সুতরাং পূর্ব্বভারত যে এককালে একটি সুসভ্য দেশ ছিল, ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর্য্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে আর্য্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্ব্বসমাজ, পূর্ব্ব-আচার ও পূর্ব্বব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম্ম হইল, শেষ সব ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধ-ধর্ম্মই পূর্ব্বভারতে থাকিয়া পূর্ব্বভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল।

পূর্ব্বাঞ্চলেই বহু ধর্ম্মের প্রসার।

বৌদ্ধদিগের অনেক আচারব্যবহার আর্য্যগণের মধ্যে নাই। বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়—কোথাও এক গাছি কেশ রাখে না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। একথা যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, যে সকল মুসলমানেরা

বৌদ্ধ ও আর্য্য আচার-ব্যবহার ভেদ।

প্রথম বেহার দখল করেন তাহাদেরও আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম আছে জানিতেন না। একটা বৌদ্ধ-বিহার জয় করিয়া তাহারা দেখিলেন সেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ রহিয়াছে তাহাদের সব মাথা কামান। সব মাথা কামান হিন্দুর হইতেই পারে না। তবে ইদানীং কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিখাত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের ন্যায় অবমাননা আর নাই। সেইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহার সম্পত্তি তাহার সঙ্গে দিবে, কেবল তাহার শিখাটি ছেদন করিয়া লইবে। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মে সকলেরই শিখাচ্ছেদ করিতেই হইত।

মাথা কামান।

আহার বৌদ্ধেরা বারটার আগে করিবে। বারটার এক মিনিট পরে আহার করিতে পারিবেন না। আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশে মারা না হয়, অন্য কারণে কোনও জন্তু মারা হয়, তাহারা সে জন্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে। রাত্রে তাহারা রস খাইতে পারে, জল খাইতে পারে, কিন্তু শক্ত জিনিস খাইতে পারে না। তাহারা পেয় খাইতে পারে কিন্তু চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য খাইতে পারে না। এই ত তাহাদের নিয়ম। এটি কিন্তু আর্য্য নিয়মের বিরোধী। আর্য্যগণ এক সূর্য্যে দুইবার খাইতেন না। সুতরাং দিনে একবার ও রাত্রে একবার। তাঁহাদের কল্যবর্ত্ত বা প্রাতরাশের কথা আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। একবার খাইয়া আর্য্যগণ চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল।

আহারের নিয়ম।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সোনা রূপা ছুঁইতে পারিতেন না। পূর্ব্বভারতে উহাদের ছোঁয়ার দরকার ছিল না। কারণ সোনা রূপার টাকা এদেশে অতি কমই ব্যবহার হইত। এদেশে কড়ির ব্যবহার অধিক ছিল, সোনা রূপা ব্যবহার না করিলেও চলিত।

স্বর্ণ রৌপ্য ত্যাগ।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ করিতেন। হিন্দুস্থানে পঞ্জাবে এমন কি ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটিয়ার উপর শোয়। মাটিতে শুইতে তাহাদের বড়ই কষ্ট হয়, পারতপক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহার বিপরীত। অধিকাংশ লোকই ভূমিতে শয্যা পাতিয়া শোয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইলে খাট চৌকি তক্তাপোষ ব্যবহার করে।

উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ।

বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। গৃহস্থ যাহারা পঞ্চশীল মাত্র গ্রহণ করিবে তাহারাও মদ খাইতে পারিবে না, একথা আর্য্যগণের পক্ষে খাটে না। তাঁহারা সোম পান করিতেন। সৌত্রামণিযাগে তাঁহারা সুরাপান করিতেন। পুরাণে বলে পূর্ব্বে সকলেই সুরাপান করিতেন, কিন্তু শুক্রাচার্য্য শাপ দেওয়ায়, মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল সময়েই চলিত, যথা পশুযাগে সোম, সৌত্রামণিতে সুরা।

মদ্য ত্যাগ।

এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও আর্য্য-ধর্ম্মে অনেক কাজের কথায়ই প্রভেদ। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল বলিতে গেলে, আর্য্য-ধর্ম্ম হইতে আসিল একথা বলা যায় না, আর কোনও দিক হইতে আসিয়াছে। এত প্রাচীনকালে আর কোন্ দিক হইতে আসিবে সুতরাং পূর্ব্বদিক হইতেই আসিয়াছে। আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব কি নূতন কথা বাহির করিয়াছেন? তাঁহার ধর্ম্মের স্থূল কথাগুলি, বিষয়গুলি যদি প্রাচীন ধর্ম্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাঁহার নূতনত্ব কি? বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও লোকে সংসার ত্যাগ করিত, ভিক্ষু হইত; যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল। সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া থাকিতে গেলেই অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ করিতে হয়, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন ভিক্ষুরাও তাহাই করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও

সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের। ভিক্ষুদিগের শাসনের জন্য যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের। এক জায়গায় অনেক ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। এইরূপ অনেকগুলি ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তিনি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, সেগুলি প্রাচীন ভারতে চলিত থাকিলেও, যে আকারে তাহাদিগকে এখন দেখিতে পাওয়া যায় সে আকারটি তাঁহার দেওয়া। তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবশিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশজনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালান, তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসঙ্ঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সঙ্ঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম্ম এত বড়, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ 'মাঝামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।' তিনি নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যাহা পাইয়া তিনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, যাহা পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে এই মধ্যমা প্রতিপৎ। মাঝামাঝি চল। অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চল যেন কোন কীট মুখে না ঢুকিতে পারে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কীট পতঙ্গ পড়ে। মলত্যাগ করিয়া তাহা কাঠি দিয়া নাড়িয়া

দিও যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে শুকাইয়া না যায়। রাস্তায় চলিবার সময় এক গাছ ঝাঁটা হাতে করিয়া যাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে কোন পোকা মাকড় মারা না যায়। এসকল বাড়াবাড়ি নয় কি? বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কোন জীবহত্যা করিও না। তাহা হইলেই অহিংসা ধর্ম্ম পালন হইবে। তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভাল নয়; কেবল ভাল খাব, ভাল পরব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভাল নয়, আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভাল নয়। তিনি নিজে যথেষ্ট কঠোর ব্রত করিয়াছিলেন, যথেষ্ট উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে কোনও লাভ নাই, শরীরের কষ্টই সার; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে এগুলা করা ভাল নয়। ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কি? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন,—আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় নদৃপ্তয়ে। এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ এইটিই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ। বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। দুটা বিরোধী জিনিস উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আরও কিছু আমার কথা

আনন্দে আনন্দময়! আনন্দকে পেয়ে আমার শোণিত-প্রবাহ, আজ উল্লাসে নৃত্য করছে, হৃৎপিণ্ড আমায় দোলা দিচ্ছে, পুলক আমার দেহ-তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করছে। আমার হিয়ার ধগ্‌ধগিতে, আমি সে প্রাণবস্তুর পরিচয় পাচ্ছি। তারি ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে আমার স্ফীতবক্ষের রক্তবিন্দুসকলের রঙ্ বদলে গেল। আমি শুভ্রতাকে পেয়ে আজ আমার "পয়োধরা" নাম সার্থক জানলাম। আর মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখ্‌লাম, এই আনন্দধরিত্রীদের অঙ্গে, সেই শিল্পী কুশলীর এই ত শ্রেয়সী বিরচনা! আজ আমার মুখশ্রীতে এক অলৌকিক স্নিগ্ধ আভা দেখে, কে যেন অনিমেষ নয়নে আমায় নিরীক্ষণ করছেন, আর আমি হ্রীবিজিতা মুগ্ধার মত ব্রীড়ানত হয়ে এক অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। আমি তাই আজ রূপের উপযাচিকা, পরশের পরিচারিকা, রসের নবনায়িকা। আজ যৌবন আমার হৃদ্‌বিহারী, গন্ধ আমার মনোহারী, শব্দ আমার ভাণ্ডারী, আর "আমি" হয়ে আছে আমার দুয়ারের ভিখারী, দূরে দাঁড়ায়ে অভিমান "মরিছে গুমরি!" আমি যে আনন্দে বিভোর হলাম। একি! অকস্মাৎ কেন আমি বধির হয়ে গেলাম, আর কানে কথা যায় না, কে আমায় অবশ করে দিলে, আর ছোঁওয়া গায়ে লাগ্‌ছে না, আমার যে চক্ষু গেল আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। রস আস্বাদন আমার মিটে গেল। একি হোল! এ যে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ, অরস। এই কি মৃত্যু! হে মরণশীল! তুমি ত আজ ভয়ঙ্কর নও, আমি ত তোমায় দেখে ভীত হচ্ছিনা। এতো তোমার সংহার মূর্ত্তি নয়! আজ বিনাশ করতে আসনি! আজ আমায় আলিঙ্গন দিয়ে, আমার আনন্দকে বাঁচাতে এসেছ? তাকে চিরজীবী করবে বলে? তুমিই অমৃতের সোপান! আজ স্পর্দ্ধা করে বল্‌তে পারব, মৃত্যুই আনন্দ,

আনন্দই মৃত্যু! দুইএর একই অমৃতস্বরূপ! "আনন্দরূপমমৃতম্, অমৃতরূপমানন্দম্।" আজ তুমি মৃত্যুরূপে মৃত্যুঞ্জয়ী নাম ধরেছ? আজ কেন এ কৃপা? এ কার কৃপা? এযে কৃপাহি কেবলম্!

পেলাম ত, ঘরে রাখ্‌তে পারব কি? এ ঘরে যে সাতভূতের কীর্ত্তন, কেউ এসে টিকে থাক্‌তে চায় না। আমার শৈশব এসেছিল, চলে গেছে। বাল্যকে আমি পেয়েছিলাম, ধরে রাখা গেলনা। কৈশোর, কৈ কিছুতেই ত রইল না। এখন যৌবন, সেও যাই যাই করছে। এ ঘরে আমার কোনই একতিয়ার নাই;—যদিও এ আমারি পৈত্রিক ভিটায়, আমারি মায়ের মালমসলায় তৈয়ারী, ন্যায্যমতে আমিই এর উত্তরাধিকারী। কিন্তু কে একে অমন বেওয়ারিসি মাল করে দিলে? যার যখন ইচ্ছা আসে যায়; এ'কে ভাঙ্গে গড়ে, গাঁথে, জোড়ে, সাজায় গোজায়; ফের দেখ্ না দেখ্ চলে যায়। না করে এরা আমায় আস্‌তে জিজ্ঞাসা। না জানিয়ে যায় যাবার বেলা! আছি যেন একটা সাক্ষী গোপাল পড়ে। আমার ছিল একখানা খুদে ঘর, ছিলাম আমি তাতে গরীবী হালেতে। না তা হোলনা; কর, কর, একে বড় কর; কর, কর, একে মনোহর কর; সাজাও দিয়ে সৌখিন সাজ, দাও তাক্ লাগিয়ে সবায় আজ। তোমরা ত তাক্ লাগিয়ে দিয়ে খালাস্! তারপর, তাল সাম্‌লায় কে বল দেখি? দেখ, বাড়ী ঘর যতই বাড়ানো হবে, বাহার তার যতই খুলবে, ততই তাতে বাসের সুখও বিস্তর পাবে, বিড়ম্বনা ভোগও বহুতর জানবে। দেখ্‌ছ না কি যে এই ঐশ্বর্য্যের বিকারে এ ঘরের সক্কলের মাথা কেমন বিগ্‌ড়ে গেছে। আমার পঞ্চ প্রভু ত থেকে থেকে, কেবলি বেফাঁস বক্‌ছে, বেহুদা হাস্‌ছে, বেয়াড়া তাকাচ্ছে, বেহুঁস চলেছে, বেয়াদবি করছে। আমি কাকে থুয়ে কাকে সামলাই! কেমনেইবা সাম্‌লাই বল? আমার আপনার মাথায়ই কত কি যে খেয়াল চাপ্‌ছে! তা যদি বলি! আমার কখনও ইচ্ছা করছে নিদ্রার মত লোচনদ্রাহিণী হয়ে, মূর্চ্ছার মত মনোহারিণী রূপে সকল সংযমীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই। আবার কখনও

এক ভুজঙ্গিনী হয়ে, তাকে বেড়িয়ে বেড়িয়ে, তার সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ঢেলে দিয়ে, পরক্ষণে শত চুম্বনে তা তুলে নিয়ে, আপনি তা পান করে, প্রেমময়কে প্রেমে পাগল হ'তে শেখাই। আমার সাধ যায়, অপ্সরার ঢঙে, আকাশ থেকে নেমে, সজ্জনের ঘরে আগুন ছুঁইয়ে ত্বরিতে পালাই। আবার এও মনে লয়, যাদুকরীর বেশে এসে, পথের পাষণ্ডকে ধরে, হেসে আপন পাশে যাদু করে রাখি। খেয়ালের কথা বল কেন? কিন্তু তা বলে আসলে কি কিছু মিলে নাই? কার দৌলতে আমার "আমি"কে তাড়ায়ে, অভিমানকে এড়ায়ে, আমার দুর্লভ দেখা দিল? আমার দূরত্ব ঘুচে গেল, আমাতে আনন্দ সম্ভব হ'ল? আমি অসহায় না ত?

আমি অসহায়, এ'কে আঁকড়ে ধরেই ত প্রাণে বেঁচে আছি। তাই সদা ভয়, এই আসা যাওয়ায় আমার কিছু আস্‌বে যাবে না ত? যৌবন! তুমি যে বড় টিপি টিপি হাস্‌ছ? তোমার মিয়াদী পাট্টা ফুরিয়ে এসেছে? তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে? এবারে তল্পিতল্পা তুল্‌বে? দোকান পাট ওঠাবে? তা হবে না, সেটি হতে দিচ্ছিনা। জোর জুলুমে না পারি, সাধ্য সাধনা করব, তাতে না কুলায় ত প্রসাধনা আরম্ভ করব। তুমি যাবে? হ'তেই পারে না। তুমি যে যৌবন! আমার তনুর তনিমা, বক্ষের গরিমা, নয়নের নীলিমা! তুমি যাবে? হে রহস্যময়! আমি যে তোমারি চাতুর্য্যে মোহিনী রমণী, তোমারি ঐশ্বর্য্যে গরবিণী গৃহিণী, তোমারি প্রসাদে সংবর্দ্ধিনী জননী। তুমি যাবে? তুমি যে আমার প্রিয়ের প্রথম অনুচর, আমার প্রেয়ের লীলা-সহচর, আমার নিত্য-মনোহর! তুমি যাবে? তুমি যে, হে সুন্দর! আমার স্পৃহণীয়, আমার স্মরণীয়, আমার ভজনীয়, তুমি যে "হয়ে জীবনের প্রভু, হাসাও কাঁদাও কভু।" আমার যে "ও রাজ চরণে তবু পরাণ লোটায়"। তুমি যাবে? তা যাবে বৈ কি? কে আমি বল্‌বার? কে আমি রাখ্‌বার? তা আমাদের কাছে থাকবে কেন? তখন তাদের বয়েস হয়ে আসে, তাতে তারা জাতে পুরুষ, সহজেই সাহস বেশী।

তারা জেনে শুনেই যৌবনে এসে পা দেয়, যৌবন সে পদস্পর্শে হেসে জেগে উঠে তাদের সেবায় লেগে যায়। আর যৌবনের যাবার নামটি নাই। আমাদের তখন যদিচ থাকে উচকা বয়েস, কিন্তু আমরা মায়ের জাত কিনা, মান রেখে চলাই আমাদের ধারার ধাত। আমরা সহজে গিয়ে কারো গায়ে পা ছোঁয়াতে পারিনা, আমাদের স্বভাবে তা দেয় না। যৌবন যেচেই আমাদের ঘরে আসে,—দেখে, আমরা তারে লাভ ক'রে সাদরে হৃদাসনে বসাই। তবুও এসেই তার যাই যাই যাই। দুনিয়ার দস্তুরই এই? "শক্তের ভক্ত নরমের যম"। তা যে যাই বল? যাই যাই করলে আর তাকে ধরে রাখা যায় না। সে কেমন উস্‌খুস্ করে, মনটা তার উড়ু উড়ু হয়ে যায়। কথা মিছে নয়, "ধরে বেঁধে প্রেম চলে না"। খোসামুদি ছাড়লাম, ডাক্‌লাম এস এস আমার "আমি", এস এস আমার অভিমান তুমি! আর তোমাদের কোণঠেসা করে রাখা কেন? তা বৈকি? এ বিলাস বিভব কে নেবে! আমার বিষাধরের সুধা অফুরন্তই রবে। আমার বাহুপাশের অমৃতক্ষরণ নিঃশেষেই চল্‌বে। যাক্ না যৌবন যেতে চায় ত! ভয় কি? ভাবনা কিসের? শোণিতপ্রবাহ! তোমরা বেঁচে যাবে, আর দিবারাত্রি ত্বড়িত বেগে কারো হুকুমে ছুটাছুটী করতে হবে না। হৃদ্‌পিণ্ড! আর ত্রস্ত দোলা দিয়ে কেউ তোমায় হয়রাণ করে দিবে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,—এ বেলা তোমাদের মস্তিষ্কের বিকারের উপশম হবে। জানি তোমরা, ফের সমজে কথা কইবে, বুঝে কাছে বস্‌বে, দেখে দৃষ্টি দেবে, ভেবে বশ করবে। যাক্‌না যৌবন যেতে চায় ত। কার ভয়? কিসের ভাবনা? মন! তুমি তবে আমার আনন্দকে এর হাত থেকে নিয়ে নেও, তবেই আমি আনন্দমনে বসে বসে এদের আসা যাওয়া দেখ্‌তে পারব। মুখের কথায় মন মানছে ত?

যৌবন যখন দোটানায় পড়ে "নযযৌ, নতস্থৌ" তখন একটু যেন দিলাশা পেলাম। মনকে চোখ ঠার দিয়ে প্রসাধনায় লাগিয়ে দিলাম।

অপাঙ্গে অঞ্জন চাই? কেন? "আঁখিতে অঞ্জন নইলে কি আঁখি-রঞ্জন মিলে?" আমার দিব্য দৃষ্টি রোখ্‌বে না ত? "ক্ষেপা! পক্ষ্ম সকল প্রহরী আছে কি করতে, পলকেই সব সাম্‌লে নিবে যে।" ভালে সিন্দুর বিন্দু চাই? ওসব ছিটা ফোঁটায় কি কারো মন তোষা যায়? প্রিয়তম হাস্‌বেন যে, ছি! তখন লজ্জায় মুখ দেখাব কেমন করে? ইন্দুমুখি! লজ্জাজড় মুখটি দেখাবার এই ত ফন্দী। কপোলে পত্রলেখা? নয় ত চিত্রলেখে! বিগতপ্রায় রক্তিম আভা ফোটাবে কিসে? বক্ষে চন্দন? "বল্লভের সেই ত চিত্ত-বিনোদন।" চরণে অলক্ত রেখা? "বিলাস প্রিয়ের এই ত মনো-লোভা।" তাই ত অঙ্গে আমার আভরণের আভা ঝলসিছে। বুঝি বা আমার দিন ফিরিল। আমি আপন মনে বসে বসে আপ্‌না রূপ দেখ্‌ছি। এ মোহিনী মূরতি বটে, মনোমোহিনী ত নয়? এ বিচিত্র চিত্র নিশ্চয়, চৈতন্যস্বরূপ ত নয়। এ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই, আমার কি স্তাবক মিল্‌বে না?

শব্দ! তুমি কারো বার্ত্তা শোনাবে না? পরশ দেখ্‌ছি গা আল্‌গা দিয়ে বস্‌ল! রূপের যেন ঢোখ বুজে আস্‌ছে, বলি রস! আর বশ করায় তোমার মতি নাই? গন্ধ! কেন আমোদ করা ছেড়েছিলে? কার কথা কে কয়? সব চুপ! আমি ত বুঝি না এ নীরব পরিহাস কেন? আমি কি তবে দিনের লাগাল পেয়ে দিনের মাথা খেলাম। আমি লজ্জা পেয়ে, সজ্জা ছাড়লাম, "এখন মরি যে লাজে!" চেয়ে দেখি চারিদিকে মৃতের আকার। তাই ত! আমি প্রাণী? অমৃতের সন্তান? মৃতের কেহ নই? তাই কি? আহা! তাই যেন হয়!

যৌবন এবারে যাবার যোগাড় দেখ্‌ল। জানান দিয়ে এর যাওয়া কেন? আর সকলের মত ফস্ করে এর যাওয়া নয় কেন? বুঝিবা এই রয়ে সয়ে যাওয়ার কোন রহস্য থাক্‌বে? না! পারলাম না আর আমি, এই মাথাপাগ্‌লা কটাকে নিয়ে? এরা আমায় প্রাণান্ত না করে ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি।

শব্দের চোট্, কে তার স্বরের মধুটুকু চুরি করেছে; পরশের কথা, কে তার মোহ-পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছে; রূপের নালিশ্, কে তার সুখদর্শনে বাদ সেধেছে। রসে এসে নাকি মেলা ভেজাল মেশাল পড়েছে। গন্ধের নাকি খাতির খতম হ'তে চল্‌ল। নালিশে আর সুপারিশে আমি একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়লাম। ঘরে কি যেন এক লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন ব্যাপার উপস্থিত। থাক্ সে শোনা কথা। নিজের চখে কি দেখ্‌ছি? আমার অমন চারু চিক্কণ চেহারার সে চটক্ কৈ? আমার নিখুঁত কপালে এ লেখা ছিল? কৈ আগে ত তা দেখিনি! এখন আর এ লেখার রেখা পোঁছা যাবে না! আমার সেই ঢল ঢল কপোলে ওসব কিসের ছাপ? আর এ ছাপ ঢাকা পড়্‌বে না! দেখ দেখ, আমার কাল' মিশমিশে চুলের দশা দেখ। দেখে হেসে আর বাঁচিনা। সারাটা দেহ ছেয়েই এই সাদায় কালোয় অদল বদল চলেছে? মন্দ না! এ যে দেখ্‌ছি কলাবিদ্যা-সমন্বিত চৌর্য্য-বৃত্তি! তুলি ধরে ধরে রঙে বেরঙ মিশিয়ে, স্থানে বেস্থানে আঁচর কেটে দিয়ে কারিগরি ফলানো হয়েছে। মতলব, মিষ্ট বস্তুটিকে মাটি করে দেওয়া। এ নষ্টামি বুদ্ধি কার? কেন "আমি"র মুখটি এবারে চুণ কেন? অভিমানের দোষ দিলে কি হবে? সে মানী লোক, আপনা মান আপনার কাছে, সে ত তোমার মত সরফরাজি জানে না, করতে চায়ও না; সে কিছু বেশ-কম দেখ্‌লে অন্তরে জ্বলে পুড়ে মর্‌লেও, কয়ে তা সে জানাবে না। ঐ পাঁচটাকে দেখাচ্ছ কি? ওরা ত আগে থাকতেই চটে আগুন হয়েই ছিল! রাগের মাথায় রাশব্দ না করাই মঙ্গল। কে জানে! কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌বে, শেষ-কালে জবাবদিহি কে হবে, বাপু?

সব সমান! এতদিনে বুঝলাম, এদের উমেদারী করা কি ঝক্-মারী। অথচ এদের ছেড়েও আমাদের বাঁচোয়া নেই। একজনকে আমরা জন্মের দাবী পাওনা পেয়ে থাকি, আর এক জনকে জন্মের সঙ্গে ফাও দিয়ে দেয়, বাকী ক'জনা জন্মশোধ সাথী হয়ে আসে।

এসব ফাও পাওনার ফেরে পড়ে, মাঝে থেকে আমরা কাঁপর হয়ে মরি যে। এদের ত দেখি দম্ভই সার, কাজের বেলায় হয়ে যায় হতভম্ব। বসে বসে "কি গেল বল্লেই কি গেল? একি অরাজকের রাজ্য পড়েছে নাকি" বলে চেঁচামেচী করলে আর চোখ রাঙ্গালেই ত আর চোর ধরা পড়ে না, চুরি বন্ধ হয় না? খোঁজ নাও, খবর-দারী কর, তবে ত তোমাদের প্রভুগিরি মান্‌ব? মন তুমি মুসড়ে গেলে যে? আমাতে ভয় এল, আমাকে ভাবনায় ধর্‌ল। যৌবন ধীরে সুস্তে তার সঙ্গের সরঞ্জাম সব সম্বরতে সুরু কর্‌ল। আমার তাক্ লাগ্‌লো, ভবনে ভাঙ্গনি লাগল। কে, ও, আমার হাবেলীর সীমানা দিয়ে, হাল্‌কা পায়ে চলা-ফিরা করছে? যেন চিনি চিনি চিননা, জানি জানি জাননা! কে তুমি? কার অত আস্‌কারা?

এবার কি তোমার প্রবেশের পালা? আরো কি ভাঙ্গবে? আরো কি গড়্‌বে? কে তুমি? দাঁড়াও, মুখ দেখ্‌তে চাই। মুখ দেখে, চম্‌কে গেলাম! চোখ দেখে মনে হোল একে ভূতে পেয়েছে। আমারি ঘরের মানুষ, জন্মইস্তক আমারি সঙ্গে মানুষ হয়ে, আজ তার এ বেইমানি বুদ্ধি? বিশ্বাস হ'ল না? কেও তলব করেছে নিশ্চয়! নয় ত, আমি ভোলা মন দেখে, আপনার খাতা খুলে সব আমার খবরাখবর টুকে রেখে দিয়েছিল, দরকার মত আমায় স্মরণ করিয়ে দিবে বলে। কত খাতির, কত স্নেহ! যেন সোদরের মত। তার আজ এ দুর্ম্মতি! আমারি খেয়ে পরে, আমারি ঘরে সিঁদ কাট্‌বে? কেমনে প্রত্যয় যাই বল? বল বল তুমি বল, কার হুকুমে একাজে লাগ্‌লে? কি! তুমি মরণের কিঙ্কর? এঘরে আসবার বেলা, দাসখৎ লিখে দিয়ে, কবুল করে এসেছিলে, চুরির মাল তাঁকে দিবে বলে? কৈফিয়ৎ দিতে হলে এই লেখা দেখাবে? তাই নিকাশের খাতাপত্তর সঙ্গেই এনেছিলে, আর লিখে লিখে রাখ্‌তে? কার মনে কি থাকে বুঝে ওঠা ভার! হে কিতব! তোমার মনে এই ছিল! হে বয়শ্চোর! এবারে কিছু

নিয়ে নিয়েছ। যা, না নিতে পেরেছ, নাশ করে গেছ; বাকী সব ছতরছান করে আমার ভিটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে সট্‌কাবে? তখন মরণ এসে আমায় ভস্ম করে আমায় মরণ দেখাবে?

ওহে ক্রীতদাস! তুমি চাকরীর চক্রান্তে পড়ে, চোখের মাথা খেয়ে, প্রভুর বিভূতি মূর্ত্তি দেখ বলে, আমারে দেখাচ্ছ মৃত্যুর ভয়? হে তস্কর! কি বুঝিবে তুমি, মৃত্যু আমার কে? আমার চিতা পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে গেলে, তাতে গঙ্গাজল ঢাল্‌লে, আমি মরা, সে জল-স্পর্শে, মরণেরি মহামন্ত্র-বলে, ভস্মস্তূপ ঢেলে অমর হয়ে উঠে দাঁড়াব। তুমি অজ্ঞান, তুমি কিঙ্কর! কি জানিবে তুমি মৃত্যুর মহিমা? আমি যে তাই বিনাশেরি পথে গিয়ে বহুকাল ধরে মরণেরি শরণ লয়েছি। হে বড় চোর! কর কর তুমি চুরি কর, যত পার, আমি আজ হতে আর তোমায় কিছু বল্‌ব না।

মুখে বল্লাম বটে! কিন্তু চোখে দেখ্‌ছি ঐ ঘরের ভাঙ্গনি, চোখে দেখ্‌ছি ঐ চোর! চোখে দেখ্‌ছি ঐ চিতার আগুন! ঐ ভস্ম হয়ে ছাই হয়ে যাওয়া। আতঙ্ক! আতঙ্ক! আনন্দ আমার গোল্লায় গেল। এ দৈব দুর্দ্দিনে, দুঃখের দিনে, প্রিয়তম পরশ আমার এক ভরসা। কিন্তু হে আমার পরশমণি! আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে জ্ঞানহারা করে দিওনা, আমি যে তা হোলে, তোমার ডাক শুনতে পাব না। ও মধুমাখা ডাক না শুনলে আমি চক্ষে অন্ধ-কার দেখি। হে সুন্দর! হে আমার অতি সুন্দর! তা হলে এ চোখ নিয়ে আর কি কর্‌ব? আমি যে চাই, সব দেখা চুকিয়ে দিয়ে, জন্মভরে এক দেখা দেখ্‌ব! আর মুখভরে বল্‌ব "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরোপিত ভেল"। আমি যে চাই সব ছোঁওয়ার বালাই নিয়ে, এক ছোঁওয়ায় মিশিয়ে দিয়ে, বল্‌তে, "নাথ নাথ যুগ হিয়া পর রাখনু তবু হিয়া পুড়ন না গেল।" তাই বল্‌ছিলাম হে আমার সর্ব্বস্বহর! আমার জ্ঞান কেড়ে নিওনা। তবেই আমার সব যাবে, আমার সর্ব্বনাশ হবে। তবু শুনছ না?

পলে পলে আমায় অবশ করে, অসার করে, আমায় কালা করে, আমায় কাণা করে দিচ্ছ? গাঢ় গাঢ়তর আলিঙ্গন? আমার যে শ্বাস বন্ধ হয়ে এল? নিবিড় নিপীড়ন? ভয় খেয়ে গেছ্‌লাম? কৈ জ্বালাত বোধ কর্‌ছিনা, আমার সবই ত রইল, সর্ব্বনাশ ত হলনা? তুমি কি গায়ে মধু ঢেলে এসেছ? তুমি অমৃতের অধিকারী? এ মধুরসে মধুপরশে আমি যে ক্রমে মধু হয়ে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে আমার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল! আর আমায় খুঁজে পাচ্ছিনা। আমি শুধু আমার ছিলাম, এখন মধুর হলাম; সঙ্গে আমার আর সবও মধুর হয়ে গেল! এখন আমার শব্দ মধুর হয়ে গেল, আমার পরশ মধুর হয়ে গেল, আমার রূপ মধুর, আমার রস মধুর, আমার গন্ধ মধুর। হে মধুকর! এই জগৎ মধুর করে দিলে? মধু, মধু, মধু! মধুময় হেরি এ ত্রিভুবন! আজ অঙ্গ দেখাচ্ছে সব মধুর চাক ঐ অঙ্গীকে; অঙ্গী দেখাচ্ছে সব মধুর চাক ঐ অঙ্গকে; আর আমি অঙ্গাঙ্গী, এই দুই মধুর চাক হ'তে, জনম জনম মধু "পিও, পিও জিওন রহব।"

শ্রীজগদম্বা দেবী।

সেকালের স্মৃতি।—বাজে কথা

৩। বঙ্কিমচন্দ্র।

১২৯৮ সালের কথা বলিতেছি। মুন্সী আমাকে অক্সফোর্ড হইতে লিখিলেন, আমরা বঙ্কিমবাবুর বহিগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ছাপিতে চাই। তুমি অনুমতি লইবার চেষ্টা কর।

তখন অক্সফোর্ডে একটি সাহিত্য-সভা ছিল। মুন্সী প্রভৃতি সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। ইংরেজ ছাত্রেরা তাঁহাদের দেশের ও ইউরোপের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদের রচনা পড়িয়া শুনাইতেন। বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাঁহাদের দেশের কবি ও ঔপন্যাসিকদিগের রচনার অনুবাদ করিয়া বিদেশী সভ্যদিগকে তৃপ্ত করিতেন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের অনুবাদ শুনিয়া বিদেশী ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সতীর্থদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের দেশের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের রচনা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাও না কেন? আমাদের ভাষায় সকল দেশের বড় বড় কবি ও লেখকদের রচনার অনুবাদ হয়। কিন্তু তোমাদের দেশের সাহিত্যের পরিচয় নাই। এই সভা হইতে, অন্ততঃ সভ্যদের ব্যবহারের জন্য, কিছু কিছু ছাপাইবার ব্যবস্থা কর।

তাই মুন্সী আমাকে বঙ্কিমবাবুর অনুমতিলাভের চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া, পর দিন প্রভাতে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের ঘরে বসিয়াছিলেন। এই ঘরটিই তাঁহার study ছিল। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। সেদিন

তাঁহাকে বেশ প্রসন্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে মুন্নীর চিঠির কথা বলিলাম।

অক্সফোর্ডের—মোক্ষমূলরের উৎকোরণের মনীষী ও সাহিত্যরসিক ছাত্রসম্প্রদায় অনুবাদে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের আস্বাদ পাইয়া ছাপাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমারা একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম। জাতির গৌরব মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, শুনিয়া বঙ্কিমবাবুও আনন্দিত হইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোনও ভাবান্তর দেখিলাম না। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, সম্মতিও দিলেন না! আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া বলিলাম, "কেন?"

বঙ্কিমবাবু গড়িয়ার কাঠের নলটি মুখ হইতে নামাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "না।"

আমি বলিলাম, "মুন্নীরা আশা করিয়া লিখিয়াছে। তাহারা দুঃখিত হইবে;—হয় ত বিদেশী সহপাঠীদিগের কাছে অপ্রস্তুত হইবে। ইহাতে আপনার ক্ষতি কি?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। একবার মনে করিয়াছিলাম, আমার বহিগুলির ইংরাজী করিয়া ছাপাইব। পরে স্থির করিয়াছি, না ছাপাই ভাল।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "রমেশ তখন বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিলাতের Publisherদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লিখিয়াছিলাম। উত্তরে রমেশ লিখিলেন, বিলাতের Publisherরা নিজের খরচে বাঙ্গালা উপন্যাসের অনুবাদ ছাপিতে চায় না। বিলাতে এখন problem লইয়া উপন্যাস লিখিবার হুজুক চলিতেছে। লোকে তাই পড়ে ও তাই কেনে। এ সময়ে অন্য উপন্যাস ছাপিলে লাভ হইবে না। রমেশের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার চিঠিপত্র চলিয়াছিল।"

রমেশ—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা

ছিল। রমেশবাবুকে অনেকবার বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছি। উভয়ে মশগুল হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

আমি বলিলাম,—"মুন্নীরা নিজের খরচে ছাপিবে। আপনি যে রকম বন্দোবস্ত করিতে বলিবেন, আমি সেই রকম করিতে লিখিব।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "তোমার যে বড় আগ্রহ! তুমিও দুঃখিত হইতেছ। কিন্তু আগে সব শোন। শুধু লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিজেই ছাপিব। তোমাকে বলি,—আমার দুই একখানা উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। তাহা আমার পছন্দ হয় নাই। আমি নিজে অনুবাদ করিব, ঠিক করিয়াছিলাম। আমার শেষের উপন্যাস কয়খানা যে উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই উহাদের অনুবাদ করিব—ভাবিয়াছিলাম। এই দেখ,—"

বঙ্কিমবাবু চেয়ার হইতে উঠিলেন; ঘরের পশ্চিম দিকে একটি আলমারীর দিকে অগ্রসর হইলেন; আলমারী খুলিয়া সকলকার উপরের তাক হইতে একখানি বড় বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন।

আমি দেখিলাম, দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "দেখ, কত খাটিয়াছি। অনুবাদ করিয়াছি। কাটিয়া কুটিয়া আবার 'ফেয়ার' করিয়াছি। তাহার পর বাঁধাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছি।—"

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "তবে এইখানিই দিন।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না; আমি বিলাতী Publisherদের কাছ থেকে estimate পর্য্যন্ত আনাইয়াছিলাম। শেষে ভাবিয়া দেখিলাম, ছাপাইয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজরা আমার উপন্যাস বুঝিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "সে কি? অক্সফোর্ডের শিক্ষিত ছাত্রদের ভাল লাগিল, ইংরেজ পাঠকের ভাল লাগিবে না?"

বঙ্কিমবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িতে লাগিলেন, আমার হাত হইতে দেবী চৌধুরাণীর পাণ্ডুলিপির খাতাখানি লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবু একবার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমি অমনই সুযোগ পাইয়া, মিনতি করিয়া,- আব্দার করিয়া বলিলাম, "একবার পরখ করিয়া দেখিলে হয় না—ভাল লাগে কি না?—তাহারা কি বলে?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "শুধু তাহাদের ভাল লাগিবে না—নয়; তাহারা গালাগালি দিবে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "গালাগালি দিবে?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "হাঁ। এই দেবীর কথাই ধর। আমি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি। এই ব্রজেশ্বরের বিয়ের কথা কি উহারা বুঝিতে পারিবে? polygamy বলিয়া চীৎকার করিবে। আমি কেন ব্রজেশ্বরের তিনটি বিবাহ দিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা বিলাতের লোক বুঝিবে না। তোমাদের দেশেও ত 'বহুবিবাহ' দেখিয়াই কেহ কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছে।"

আমি তবু নিরস্ত হইলাম না; সাহস করিয়া বলিলাম, "তাহা ত পুস্তকের ভূমিকায় বুঝাইয়া দিলে হয়।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমাদের আব্দার রাখিতে পারিলে আমি খুসী হইতাম। কিন্তু আমি এখন ইংরেজীতে আমার বই বাহির করিব না। তোমাদের অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না—কিছু মনে করিও না।"

আমি নিরাশ হইয়া ফিরিলাম, এবং মুন্সীকে বঙ্কিমবাবুর প্রত্যাখ্যানের কথা লিখিয়া দিলাম। Private circulationএর জন্য ছাপিবারও বঙ্কিমবাবু অনুমতি দিলেন না।

দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর কৃত "দেবী চৌধুরাণী"র অনুবাদ হারাইয়া গিয়াছে। আমি বঙ্কিমবাবুর দ্বিতীয় দৌহিত্র, স্নেহভাজন

শ্রীমান পুরেন্দুসুন্দরকে দেবীর অনুবাদ ছাপিতে বলি। তিনি পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান নাই।

গ্রন্থকারের নিজের অনুবাদটি নষ্ট না হইলে, তাহা ভবিষ্যৎ অনুবাদকদিগকে পথনির্দ্দেশ করিতে পারিত।

সাহিত্যের প্রাণ স্বদেশী। তাহাতে সার্ব্বভৌমিক ভাবও থাকে। তবু এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের আদর্শ হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু আমার মত নাবালকের নিকট তাঁহার আপত্তির সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর কাহারও সহিত তাঁহার কথা হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, "এখন ইংরেজীতে আমার বই বাহির করিব না।" তিনি কি অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন? তাঁহার সমস্ত উপন্যাস ত উদ্দেশ্যমূলক নয়। সেগুলির অনুবাদ করিবার অনুমতি দিলেন না কেন?

এখন একটা কথা মনে হইতেছে। বঙ্কিমবাবু খাঁটী 'স্বদেশী' ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে 'স্বদেশ' দেখাইয়া ও চিনাইয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশের জন্যই লিখিতেন। শেষ জীবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যসেবাও নিষ্কাম ও উদ্দেশ্যমূলক ছিল। সে উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যাহা দেশের বস্তু, দেশে সার্থক হইবার হয়—হউক, ইহাই হয় ত তাঁহার কামনা ছিল।

* * * * * * *

ইহার অনেক দিন পরে বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি আর উপন্যাস লিখিবেন না? আমরা কি পড়িব?"

বঙ্কিমবাবু যেন আমাদের পড়িবার জন্যই উপন্যাস লিখিতেন! বঙ্কিমবাবু এ ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তা ঠিক বলিতে পারি না। তবে অনেক দিন থেকে একটা জিনিস লিখিবার ইচ্ছা

আছে। হইয়া উঠিতেছে না। বৈদিক যুগের ছবি দিয়া একখানা উপন্যাস লিখিব। তবে—হইয়া উঠিবে কি না, বলিতে পারি না।"

বঙ্কিমবাবু অনেক দিন বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন; বেদের দেবতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। সেই সময়েই বোধ হয় এই সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা 'হইয়া উঠিবার' পূর্ব্বেই বঙ্কিমবাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আরম্ভ করিয়াছেন?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না; আরম্ভ করিতে পারিলে শেষ হইয়া যায়।—যদি লিখিয়া উঠিতে পারি, এবং তোমাদের ভাল লাগে, তা হ'লে, ইংরেজী করে' ছাপান যাবে। কি বল?"

আমার সেই আগ্রহের কথা তখনও বঙ্কিমবাবুর মনে ছিল! আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

* * * * * * *

১২৯৯ সালে বাঙ্গালা দেশে সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলন আরব্ধ হইল। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। উভয় পক্ষের আগ্রহ ক্রমে বিরোধের সন্নিহিত হইল। বিচার ক্রমে বিতণ্ডায় পরিণত হইল। বিতর্ক ক্রমে চরমে উঠিল। সংবাদপত্রে বাঁদরামী দেখা দিল।

স্বর্গীয় শ্যামলাল মিত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী; সমুদ্র-যাত্রার সমর্থন করিতেন। এই সময়ে "জন্মভূমি"তে সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্যামলাল বাবু সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাহার পর, "সাহিত্যে"র এক জন পৃষ্ঠপোষক, আমার অগ্রজতুল্য,

প্রতিষ্ঠাশালী সুলেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন; এবং "সাহিত্যে" ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দেন।

প্রবন্ধটি পাইয়া, আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পড়িয়া গোলে পড়িলাম। আমাদের "সাহিত্য" তখন প্রায় গণতন্ত্র ছিল। এখন গণও নাই, তন্ত্রও নাই; জনও ত খুঁজিয়া পাই না।—যাক, এখন গণের কথাই বলি। এই রচনার লেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে 'বানর' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "প্রবন্ধটি ছাপিয়া কাজ নাই।"

গণের কেহ কেহ আমার সমর্থন করিলেন; কিন্তু অনেকেই ছাপিতে বলিলেন। যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার লেখাই তখন "সাহিত্যে"র প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁহার লেখা না ছাপা সুবুদ্ধির কাজ নয়, তাহাও শুনিলাম। কিন্তু সকলেই স্বীকার করিলেন, প্রবন্ধটির শ্লেষ বিদ্রূপ খুব smart হয় নাই। কিন্তু এক জন—হায়! তিনি আর ইহলোকে নাই—স্বর্গীয় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "রচনা বেশ হইয়াছে। তুমি appreciate করিতে পারিতেছ না।" নলিনীর মতে আমার শ্রদ্ধা ছিল।—অমন স্নেহময়, প্রেমময় বন্ধু আর পাইব না। অমন সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। সাহিত্যই তাহার জীবনের সম্বল ছিল। কাব্য ও কবিতা ও কলাসৌন্দর্য্যে নলিনী মগ্ন হইয়া থাকিত। সংসারের দারিদ্র্য, দুঃখ, আবিলতা, কঠোরতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। নলিনীকে আমরা 'কবি' বলিয়া উপহাস করিতাম। নলিনী টুর্গেনেফ্, টলষ্টয়, হায়েন প্রভৃতির নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিল। চৈতন্য-লাইব্রেরীতে সে যখন এই সকল গ্রন্থকারের কেতাবের আমদানী করে, তখন অনেকের পক্ষে সে সকল প্রহেলিকা ছিল। শান্ত, নম্র, ধীর, সারস্বত,—সংসারের কুটিল চক্রে অনভিজ্ঞ নলিনী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কৈশোরের সরলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

"দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চরিত্র সুন্দর!" নলিনীর পক্ষে অন্বর্থ বলিয়া মনে হইত। নলিনীর জীবন বলিত—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবন-স্থলে!"

দরিদ্র নলিনীও সারদাকে বলিতে পারিতেন,—বোধ হয় মনে মনে বলিতেন,—

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী, যার খুসী তার!"

নলিনী "সাহিত্যে" অনেকগুলি সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন। আজকাল মোপাঁসা ভাজা, মোপাঁসা চচ্চড়ি, মোপাঁসার ছেঁচ্‌কী, মোপাঁসার ছ্যাঁচ্‌ড়ার ছড়াছড়ি হইয়াছে। কিন্তু নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালীকে মোপাঁসার গল্পের আস্বাদ দিয়াছিলেন।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। ইহার পূর্ব্বে দুই চারিবার বঙ্কিমবাবুর পরামর্শ পাইয়া উপকৃত ও চরিতার্থ হইয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"আজ রাখিয়া যাও। কাল কি পরশু আসিও।"

দুই দিন পরে অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণের বৈঠকখানায় জানালায় দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম; বঙ্কিমবাবু ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "বসো।" তাহার পর আবার দক্ষিণমুখো হইয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর ঢাকা বারান্দায় একটি নয় দশ বৎসরের মেয়ে—যেন শিশিরস্নাত ক্ষুদ্র যূঁই। মেয়েটি হাসিতেছে, বঙ্কিমবাবু হাসিতেছেন। ক্ষুদ্র শিশুর সহিত শিশু হইয়া বঙ্কিমবাবু খেলা করিতেছেন! মেয়েটি যাইবার সময় বলিল, "সাধের তরণী আমার কে

দিল তরঙ্গে!" বঙ্কিমবাবু প্রফুল্লচিত্তে স্মিতবিকশিতমুখে একখানি সোফায় বসিলেন,—আমাকে বলিলেন, "মেয়েটি আমার সই!"

পাশের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিতেছিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কথা শুনিয়া তটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমার বড় নাতি হারমোনিয়ম বাজাইতেছে। আমি নাতিদের সঙ্গে খেলাধূলা করি। হারমোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছি। বাড়ীতেই বাজায়, গায়, আনন্দ করে। আমি উহাদের বাহিরে যাইতে দিই না। তুমি বাজাইতে পার?"

আমি বলিলাম, "না।"

"গান বাজনা তোমার ভাল লাগে না?"

"আমি খুব ভালবাসি।"

"তবে শেখ না কেন?"

অনেক জিনিস ভালবাসিতাম, কিছুই ত শিখিতে পারি নাই! কি উত্তর দিব?

দাদামহাশয়েরা অনেক চেষ্টা করেন, হারমোনিয়মও কিনিয়া দেন; পণ্ডিত, মাষ্টার, উপদেশ—চেষ্টা—যত্ন, কিছুরই ত্রুটী হয় না। কিন্তু তাঁহারা বিধিলিপি মুছিয়া দিতে পারেন না। কল্পনায় ভবিষ্যৎ গড়িয়া দেন, কিন্তু প্রাক্তন বর্ত্তমানও গড়ে, ভবিষ্যৎও গড়ে। আজ দিব্যেন্দুর 'দাদা' আর আমার দাদামশায়ের কথা এক সঙ্গে মনে হইতেছে। তাঁহাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছে। তাঁহাদের কত আশা বিফল করিয়াছি। কিন্তু বিনিময়ে কি পাইয়াছি? সে সম্ভাবনা কি আর ফিরিবে? তাহার বিনিময়ে আজ যে সর্ব্বস্ব—জীবন দিতে পারি!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমার সেই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।"

"আপনার কি মত?"

"তুমি সম্পাদক,—তোমার মত কি আগে শুনি?"

"আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমার মতের মূল্য কি? আপনার মত কি, বলুন?"

বঙ্কিমবাবু আমার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আগে তোমার মত কি বল।"

আমি বলিলাম, "আমার ছাপিবার ইচ্ছা নাই।"

"কেন? তুমি কি সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ? আষাঢ় মাসের 'সাহিত্যে' ত 'সমুদ্র-যাত্রা'র পোষক প্রবন্ধ ছাপিয়াছ?"

"প্রবন্ধ সুলিখিত ও যুক্তিযুক্ত কি না, আমরা তাহাই দেখি। আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও আমরা ছাপি।"

"তবে এটা ছাপিবে না কেন?"

"যাহারা সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ, তাহারা সমুদ্র-যাত্রার পক্ষদিগকে গালি দিতেছে। এ পক্ষ হইতে সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষদিগকে গালি দিয়া সেই দলে ঢুকিয়া কোনও লাভ নাই।"

"গালি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কি সব সময়ে মন্দ?—অনেক সময়ে বিদ্রূপে অনেক কাজ হয়; জান?"

আমি বলিলাম, "এ লেখাটি কি আপনার ভাল লাগিয়াছে?—ইহার ব্যঙ্গ—"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমার কি মনে হয়?"

আমি বলিলাম, "আমার খুব smart মনে হয় নাই।"

"সবই কি খুব smart হয়?"

আমি বলিলাম, "প্রতিপক্ষকে বাঁদর বলিলে কি রসিকতা হয়? পুরাণো কাসুন্দী ঘাঁটিয়া লাভ কি?"

"পুরাণো কাসুন্দী?"

"আপনার সেই ব্যাস্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের চর্ব্বিতচর্ব্বণ। ইহাতে মৌলিকতা নাই। সাহিত্যের হিসাবেও রচনাটি আমার এমন সার্থক মনে হয় নাই—যে জন্য, গোঁড়াদের যে ব্যবহারের নিন্দা করি, সেই কুকার্য্য নিজেরা করিতে পারি।—তবে আপনি যদি ভাল মনে করেন—"

"না; আমি তোমার সব কথা না শুনিয়া কিছু বলিব না।—বাবু যদি চটেন? তোমার কাগজে তিনি খুব লেখেন, এবং বেশ লেখেন।"

"আমি বুঝাইয়া, মিনতি করিয়া চিঠি লিখিব।—তাতেও যদি চটেন, আমি কি করিব।"

আমি বুঝিলাম, বঙ্কিমবাবু আমার কথা শুনিয়া খুসী হইলেন। পকেট হইতে সেই রস-রচনাটি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"আমি সম্পাদক হইলে, ইহা ছাপিতাম না। আর ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এ সব রচনা খুব original—smart,—to the point না হইলে effective হয় না। এটা শুধু গালাগালিই বটে।"

আমি বাড়ীতে আসিয়া প্রবন্ধটি ফেরত দিলাম। মহিলা-সম্পাদিত একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকে পরে তাহা ছাপা হইয়াছিল।

১২৯৯ সালে আমার বিচারশক্তি ঠিক বঙ্কিমবাবুর মত ছিল, এবং আমি খুব বাহাদুর ছিলাম, আশা করি, আমার গুণগ্রাহী জনার্দ্দনদিগকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি, এবং তাঁহাদিগকে নাক তুলিয়া আমার শ্রাদ্ধ করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছি! আমি কিন্তু কলমটি রাখিবার সময় সেই স্নেহময় মনীষীকে স্মরণ করিয়া ভাবিতেছি,—তাঁহার এত অনুগ্রহ ছিল, এমন আদর্শ মিলিয়াছিল, বিধাতা সব বিফল করিলেন কেন? অথবা, "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদগ্রাহে মণি র্ন মৃদাং চয়ঃ"—ভবভূতির এই বাণী বিফল হইবার নহে।

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

———

বংশী-ধ্বনি

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের নীরবতা করি দূর,
অহেতু আনন্দ-রসে ব্রজ-হিয়া করি' পূর
বাজিল মুরলী ;
অনন্ত অসীম নভ সে সুরে উঠিছে ভরি',
ক্ষুদ্র তৃণ, ধূলিকণা সে সুর হৃদয়ে ধরি'
পড়িতেছে ঢলি'।
সে সুরে পুলক-ভরে কদম্ব শিহরি' উঠে,
চম্পক অশোক নাগ কানন ভরিয়া ফুটে,
অশথ নিশ্চল ;
উল্লসিত গিরি-দরী, নির্ঝর হরষে ঝরে,
বাড়ায় তরঙ্গ-বাহু যমুনা প্রণয়-ভরে
আকুল বিহ্বল।
জড়ের ভিতরে বুঝি সে সুরে চেতনা জাগে,
নবীন জীবন পেয়ে হের সবে অনুরাগে
হ'য়ে তৃষাতুর
বাঁশরীর সুর-সুধা আকণ্ঠ করিছে পান,
আস্বাদ করিছে যেন সে সুরে কাহার প্রাণ
অজ্ঞাত মধুর !
মুরলীর মোহময় মধুময় শুনি' রব
নৃত্য করে রঙ্গ-ভরে ময়ূর ময়ূরী সব
সুখে পুচ্ছ তুলি' ;
শুক সারি পিক আদি যতেক সুকণ্ঠ পাখী
ডালে বসি' শুনে বাঁশী আনন্দে মুদিয়া আঁখি
নিজ গান ভুলি'।

চকিত বিলোল নেত্র ঊর্দ্ধপানে প্রসারিয়া
আনন্দে কুরঙ্গযূথ সে সুর-অমিয়া পিয়া
থমকি' দাঁড়ায় ;
মধুর বেণুর গানে আকুল ধেনুর প্রাণ,
বৎসগুলি ভুলি গিয়া জননীর স্তনপান
দিশাহারা ধায়।
স্থাবর জঙ্গম যেন লভিতে সঙ্গম কার
অবিদিত ভাব-ভরে খুলিয়া হৃদয়-দ্বার
রহে প্রতীক্ষায় ;
কে যেন আড়ালে বসি' করিতেছে আবাহন,
তার যেন সাড়া পেয়ে অচেতন সচেতন
অভিসারে ধায় !
যমুনা মথিত করি' মরি সে মুরলী-সুর
মোহিত করিল গিয়া গোপ-গোপী-হৃদি-পুর
সুদূর গোকুলে ;
যেমনি শুনিল বাঁশী, উদাসী হইল হিয়া,
অদৃশ্য কুহক যেন সবারে টানিয়া নিয়া
আনে নদী-কূলে।
কান্ত-পদ-সেবা-রতা চরণ ছাড়িয়া ধায়,
অনাদর ভুলি' তার পতি বন-পথে ধায়
সুর অনুসরি' ;
শিশু ফেলি' ধায় নারী, পয়োধরে ক্ষীর ঝরে,
বনিতার বাহু-পাশ বাঁধিতে না পারে নরে,
চলে ত্বরা করি'।
কে যেন কোথায় বসি' ডাকে নিজ গণে তার,
গেহ দেহ ভুলি' তাই নরনারী অনিবার
চলে তার পানে ;

কুল মান ভুলে গোপী, বিহ্বল গোপের প্রাণ,
নাচে সবে নদী-তীরে আনন্দ করিয়া পান
পাগল পরাণে।
বাঁশীর সুরের নেশা সবারে পাগল করে,
যুবক যুবতী কিবা বাল বৃদ্ধ সমস্বরে
করে সংকীর্ত্তন ;
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ "কৃষ্ণ কোথা" ডাকে,
কেহ বা যমুনা-বারি প্রেমানন্দে অঙ্গে মাখে
স্মৃতি-নিমগন।
কেহ পিতা কেহ মাতা, কেহ সখা সখী কেহ,
কিঙ্কর কিঙ্করী ভাবে কেহ বা লুটায় দেহ
হ'য়ে আত্ম-হারা ;—
কেবল বিরলে এক কিশোরী আছিল ধ্যানে,
বঁধুর বাঁশরী-সুর পশেনি তাহার প্রাণে
ভেদি' দেহ-কারা।
নিগূঢ় মরমে তার যে প্রেম-যমুনা বয়,
না উঠে তরঙ্গ তাহে ; শান্ত সুপ্ত সে হৃদয়
অতল, অটল ;
বাহ্য উন্মাদনা ওই বাঁশী তথা নাহি বাজে,
বংশীধর নিজে তার দেহাতীত চিত্তমাঝে
মগ্ন অবিরল !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

বাঙ্গালার আদি নাটক

ভদ্রার্জ্জুন।

বাঙ্গালা ভাষার আদি নাটক "ভদ্রার্জ্জুন" মহাভারতের "সুভদ্রা-হরণে"র কাহিনী লইয়া রচিত। সুভদ্রা-হরণের আখ্যানটি বাঙ্গালী কবিগণের বড়ই প্রিয়। তেজস্বিনী সুভদ্রার রথ-সঞ্চালন-কাহিনী তাঁহাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। মাইকেল "সুভদ্রা-হরণ" নামক একখানি কাব্য-রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।* কিন্তু উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

"তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা-সুন্দরি!
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে! আশার লহরী
শুকাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে।

* * *

কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কর, পূজি দ্বৈপায়নে
(ঋষিকুলব্রত দ্বিজ) গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুমি বিজ-জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে॥"

মাইকেলের এই অসমাপ্ত ব্রত পরে নবীনচন্দ্র "রৈবতক" কাব্য-প্রণয়ন করিয়া উদ্‌যাপন করেন। মাইকেল 'সুভদ্রা-হরণ' লিখিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন—

---

* মাইকেলের অসম্পূর্ণ 'সুভদ্রা হরণ' কাব্যের প্রারম্ভ এইরূপ :—

"কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসীজনে।"

এই বাণী তাঁহার পক্ষে ঘটিল না বটে, কিন্তু ভবিষ্যদ্‌বাণীরূপে সফল হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার পর নবীনচন্দ্রই সুভদ্রা-হরণ কাহিনী অবলম্বনে "রৈবতক" রচনা করিয়াছিলেন। এই সুভদ্রা-হরণ কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বিষবৃক্ষে দেখি—

"এক চিত্রে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শুভ্রপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবীসেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদের পতাকাশ্রেণী এবং রঞ্জোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘসকল চূর্ণ করিতেছে। সুভদ্রা আপন সারথ্য-নৈপুণ্যে প্রীত হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জ্জুনের দিকে বক্রদৃষ্টি করিতেছেন, কুন্দ দন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন, রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলকসকল উড়িতেছে, দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।"

[চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার বঙ্কিম কল্পনার তুলিকায় এই সুভদ্রা-হরণের কৌতুকজনক আধুনিক সংস্করণও অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন,—

"একদিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ী হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ষা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্য জন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা

"কেমনে ফাল্গুনী শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদুবৃন্দে) চারু চন্দ্রাননা
ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসীজনে,
বাগ্দেবি! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।"

ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দশনিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একেবারে গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোম্‌টা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজহস্তে বল্গা ধারণ করিয়া গাড়ী অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, 'তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।"

[চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু অপ্রসিদ্ধ কাব্য ও নাটককার সুভদ্রা-হরণ চিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন। "ভদ্রার্জ্জুন" নামক বাঙ্গালা ভাষার আদি নাটকও এই সুভদ্রা-হরণ বৃত্তান্ত লইয়া রচিত।

"ভদ্রার্জ্জুন" নাটকখানি রচনাগুণে যে সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করিবে তাহার সম্ভাবনা না থাকিলেও, আদি নাটক বলিয়া ইহার অপেক্ষাকৃত বিশদ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনেরও কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাঙ্গলা-ভাষার আদি নাটকখানি কিরূপ তাহার বিশদ ধারণা যাহাতে পাঠকমাত্রেই করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার বহুস্থল উদ্ধৃত করাইয়া দেখাইতেছি।

নাটকখানির দৃশ্যে দৃশ্যে ক্রিয়া (Action) কিছুই নাই। কাশীরামদাসের মহাভারত যেরূপ পয়ারাদি ছন্দে রচিত, নাটকের পাত্রপাত্রীও তেমনি পয়ারাদি ছন্দেই কথোপকথন করিতেছে। অতি অল্প স্থলেই গদ্যে কথোপকথন আছে। একখানি কাব্যের পংক্তিগুলি কথোপকথনচ্ছলে লিখিলে যেরূপ হয়, নাটকখানির অধিকাংশ স্থলই সেইরূপ। নাটকোচিত ক্রিয়া বা জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি "ভদ্রার্জ্জুনে" নাই। চরিত্রের মধ্যে বলদেবের অভিমান, ভীমের ক্রোধ

ও নারদের কলহপরায়ণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রৌপদীচরিত্র আদৌ ফুটে নাই। সত্যভামা ও রুক্মিণী—কৃষ্ণের এই দুই পত্নীর চরিত্র নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয় চরিত্রের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না। কেবল রমণীগণের কথোপকথন ও ক্রিয়াকলাপ আঁকিতে গিয়া নাট্যকার যেখানে তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গমহিলা-চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছেন, সেই স্থলগুলি এই হিসাবে দুষ্ট হইলেও বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।

'ভদ্রার্জ্জুনে'র প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসভা। যুধিষ্ঠির রাজসভায় বসিয়া আছেন, "নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।" এই গীতেই নাটকের আরম্ভ। গীতটির প্রথমাংশ এইরূপ,—

[রাগিণী মূলতানী। তাল কাওয়ালী।]
জয় যদুকুল-তিলক দৈত্য-অরে।
হের মতিহীন পামরে মর্ত্য-পরে। ধ্রু।
দুঃখভঞ্জনরূপ তব ভক্তিভরে।
যেবা চিন্তয়ে লভে সেই মুক্তি পরে॥
নহি সখ্যতা-ভাবে পায় ব্যগ্র নরে।
করে শত্রুতা যেই সেই শীঘ্র তরে॥
ইত্যাদি।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে সাবধান করিয়া দিলেন, দ্রৌপদীর জন্য যেন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, এবং নিয়ম করিয়া দিলেন, "তোমরা একএকজন দ্রৌপদীসহিত কালক্ষেপণ করিবে এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহ প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটন করিতে হইবেক।" (১০ পৃষ্ঠা) একজন ব্রাহ্মণের গোধন দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অর্জ্জুনকে, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির যেখানে বিরাজমান ছিলেন, সেই অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে হইল। কাজেই পূর্ব্বোক্ত নিয়মভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি তীর্থযাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে দেখি, সুভদ্রা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, দেবকী ও রোহিণী বসুদেবকে পাত্র সন্ধান করিতে বলাতে, বসুদেব বলরামের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। বলরাম দুর্য্যোধনকে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। দেবকী ও রোহিণী এই কথা শুনিয়া প্রতিবেশিনীর সহিত এই প্রকার যুক্তি করিতেছেন,—

রোহিণী। বরটি নাকি বড় ভাল।
দেবকী। কে বল দেখি?
রো। রাজা দুর্য্যোধন।
দ। আমি শুনিয়াছি তাহার নাকি বড় দুষ্ট চরিত্র।
রো। বিলক্ষণ, সে কি কথা? এমন হবে না।**
দে। আবার তার বাপ কাণা।
রো। তার বাপ অন্ধ তাতে ক্ষতি কি? সে ত কাণা নয়?
দে। ওমা, সেকি? একটা কাণা বেয়াই হইবে? একে দুর্য্যোধনকে সকলে কাণা রাজার বেটা, কাণা রাজার বেটা বলে, আবার সুভদ্রাকে কি কাণার বৌ, কাণার বৌ বলিয়া ডাকিবে? ওমা, সেটা বড় লজ্জার কথা।**
সহচরী। কেমন গো প্রতিবাসিনী, তুমি ত এই পাড়ার একজন প্রবীণা। অনেক দেখিয়াছ শুনিয়াছ। রোহিণী কি মন্দ বলিতেছে তুমিই বিবেচনা কর দেখি? ছেলের বাপের যদি কোনও অঙ্গে দোষ থাকে, তাহাতে পাত্র ত সে দোষে দোষী হয় না?
প্রতিবাসিনী। হাঁ গো বোন্, আমি বিবেচনা করিয়াছি। দেবকী, রোহিণী উহারা ত সেদিনকার মেয়ে, আমি উহাদের বাপের পর্য্যন্ত বিয়া দেখিয়াছি।
[২য় অঙ্ক, ৩য় সংযোগস্থল।]

এই কথোপকথনটি বাঙ্গালী গার্হস্থ্য-চিত্রে বেশ খাপ খাইতে পারে, কিন্তু রাজা দুর্য্যোধনের পত্নীকে 'কাণার বৌ' বলিবে এইরূপ আশঙ্কা ও প্রতিবেশিনীর সহিত পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ প্রাচীন যুগের চিত্র নয়। বাঙ্গলার প্রাচীন লেখকগণ যেমন শিবদুর্গাকেও খাঁটি বাঙ্গালী দম্পতি সাজাইয়া তাঁহাদের কোন্দল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, 'ভদ্রা-

অর্জ্জুন'-রচয়িতা তারাচরণ শিকদারও নাটকখানির সর্ব্বত্রই প্রাচীন-কালের রমণীচরিত্র অঙ্কনে প্রয়াস না করিয়া বাঙ্গালীর মেয়েরই চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ভদ্রার্জ্জুনের রমণীগণের চরিত্র, রীতিনীতি, কথোপ-কথন সবই বাঙ্গালী ধরণের। সেইজন্যই নাট্যকার তবু কতকটা স্বাভাবিকতা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। নাটকের অন্যান্য চরিত্রের কথোপকথন অধিকাংশই কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে, অর্জ্জুন প্রায়শ্চিত্তহেতু তীর্থযাত্রাক্রমে প্রভাসতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছেন। অভ্যর্থনার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "রৈবত" (রৈবতক ?) পর্ব্বতে লইয়া চলিলেন। অট্টালিকার উপর হইতে সত্যভামা ও সুভদ্রা অর্জ্জুনের আগমন দেখিতেছিলেন। অর্জ্জুনকে দর্শনমাত্রই সুভদ্রা তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন। পরে সত্যভামা তাঁহার এই অবস্থা জ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরামর্শের পর নিশীথে সুভদ্রাকে লইয়া অর্জ্জুনের শয়নাগারে উপস্থিত হইলেন ও উভয়ের গান্ধর্ব্ববিবাহ সঙ্ঘ-টন করিয়া দিলেন। এদিকে বলদেব পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনকে সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এখন নারদ গিয়া বল-দেবকে এই গান্ধর্ব্ববিবাহ সংবাদ দিলে বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যো-ধনকে ত্বরায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে নিজ উদ্দেশ্যও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিলেন যে সুভদ্রার সহিত তিনি দুর্য্যোধনের বিবাহ দিবেন। তৃতীয় অঙ্ক এইখানে শেষ হইল।

চতুর্থ অঙ্কে দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া বরসাজে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন ও যুধিষ্ঠিরের উপদেশে ভীমও সৈন্যসহ বরযাত্রী হইলেন, এই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথমে দুর্য্যোধন আসিতেছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সুভদ্রাহরণে পরামর্শ দিতেছেন। অন্তঃপুরমধ্যে তখন দুর্য্যো-ধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইবে এই বিশ্বাসে রমণীগণের মঙ্গল আচার আরম্ভ হইয়াছে। কৃত্তিবাস যেরূপ সীতার বিবাহোৎসব বর্ণ-

নায় বাঙ্গালীর বিবাহ-আচার বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে নাট্যকারও সেইরূপ খাঁটি বাঙ্গালীর সংসারের বিবাহ-চিত্রই আঁকিয়াছেন,—

"রুক্মিণী। ... চল সকলে ভদ্রাকে হরিদ্রাদি লেপন করাইয়া স্নানার্থ লইয়া যাই। কোথা গো সহচরি, তোমরা শঙ্খাদি মঙ্গলধ্বনি কর ও হরিদ্রাদি আন।

সহচরী। ঠাকুরাণি, সকল প্রস্তুত করিয়াছি, ইহা কি ভুলিবার কথা? প্রতিবাসিনি, তুমি এযোগণের মধ্যে প্রাচীনা। অগ্রে তুমিই সুভদ্রার গাত্রে হরিদ্রা দেও।

প্রতিবাসিনী। আমি হরিদ্রা মাখাইতেছি, তোমরা কেহ শঙ্খরব কর, কেহ বা উলু উলু ধ্বনি দেও। [শঙ্খাদি মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল।] সত্যভামে, আমাদিগকেই অদ্য নিশায় বাসর জাগিতে হইবেক; দেখা যাইবে দুর্য্যোধন কেমন চতুর ও কত টাকাই বা শয্যা-উঠানি দেয়।

রুক্মিণী। ওগো রজনীর কর্ম্ম রজনীতে হইবে; এক্ষণকার মঙ্গলকর্ম্ম যাহা তাহা শীঘ্র সমাধা কর, এখনও নান্দীমুখাদি অনেক কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে। সকলে। হাঁ, এখন অন্য কথা রাখ, চল ভদ্রাকে আগে স্নান করাইয়া আনি।

[সকলে নানাবিধ বাদ্যাদি লইয়া উলুধ্বনি করিতে করিতে সরোবরতীরে গমন করিলেন।]"

[৫ম অঙ্ক, ৬ সংযোগস্থল।]

সরোবরতীরে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিলেন। যাদবগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যাদবগণ পরাজিত হইলেন। দুর্য্যো-ধন বরসাজে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রস্থান করিলেন। বলরাম নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণে সহোদর ভিন্ন, আমি নাহি জানি অন্য
কৃষ্ণের তেমন মন নয়।
চক্রী এক নাম তাঁর, তার চক্র বুঝা ভার
চক্র করি নিজ কার্য্য লয়।...
দিয়া আপনার রথ অর্জ্জুনে দেখায় পথ
হরিবারে মর্ম্ম সহোদরা।

কৃষ্ণের সাহস পায় অর্জ্জুন হরিল তায়
সতত কৃষ্ণের এই ধারা ॥
গৃহমধ্যে শত্রু যার, জীবন তাহার ছার
তার সাক্ষী দেখ দশাননে।
নিজ সহোদর হয়ে রামের শরণ লয়ে
বিভীষণ বধে রক্ষোগণে ॥
তোমাদের প্রিয় হরি আমি সকলের অরি
এই হেতু ডুবালে আমায়।
ভাল ভাল বুঝা গেছে যা হবার হইয়াছে
এবে আর কি আছে উপায় ?.....
এখন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহবাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহবাস
সব আশা ঘুচেছে আমার ॥"

বলরামের এই খেদোক্তির পরই "ভদ্রার্জ্জুন" নাটকের যবনিকা পড়িয়াছে।

বাঙ্গালায় বৈষ্ণবযুগে রচিত সংস্কৃত নাটকগুলির পদ্যে অনুবাদ হইয়াছিল। এমন কি অনভিজ্ঞ লেখক এই সকল পদ্যে অনুবাদিত নাটক দেখিয়া কাব্য * লিখিয়া তাহার নাটক নাম দিয়াছিলেন। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রেম নাটক" ও "রমণী নাটক" ইহার দৃষ্টান্ত। "ভদ্রার্জ্জুন"-প্রণেতা পাশ্চাত্য নাটক পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার মনে নাটক ও কাব্যের প্রভেদ জ্ঞান বিশেষরূপেই জাগ্রত ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার নাটকখানির অনেক স্থলে কাব্যো-

* "কাব্য" এখানে আধুনিক প্রচলিত অর্থেই ব্যবহৃত হইল। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্য দুই প্রকার, দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্য কাব্যই নাটক। এখন বাঙ্গালায় কাব্য বলিতে সাধারণতঃ শ্রব্য গীতিকাব্যই বুঝাইয়া থাকে। এই অর্থেই এখানে আমরা "কাব্য" শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

চিত ভাষার অবতারণা হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। কাব্যে বিস্তৃত উপমা উৎপ্রেক্ষাবহুল অতিশয়োক্তিপূর্ণ অনুপ্রাস বা যমকযুক্ত রচনা শোভা পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু নাটকে এরূপ রচনা আদৌ প্রয়োগার্হ নহে। কিন্তু কাব্যরস বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জার সহিত এরূপ বিজড়িত যে বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে তাহা স্থানে অস্থানে প্রযুক্ত হইতে থাকে। কেবল 'ভদ্রার্জ্জুন'-প্রণেতা কেন, মাইকেল, দীনবন্ধু, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মনোমোহন বসু প্রভৃতি সকল নাট্যকারই অল্পাধিক পরিমাণে এ বিষয়ে দোষী। গেটের ফাউষ্ট, বাইরণের ম্যানফ্রেড্ বা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যাংশে সুমোহন হইলেও এগুলি অভিনয়োচিত নাটকের মধ্যে উচ্চস্থান দাবী করিতে চাহে না। 'ভদ্রার্জ্জুনে' ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির অনুকরণে যেখানে যেখানে নাট্যকার কাব্যরস-সিঞ্চনে নাটকের সৌষ্ঠব বিধান করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, সেইখানটিই কৃত্রিমতাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। সুভদ্রা লিম্নলিখিতরূপে অর্জ্জুনের রূপ বর্ণনা করিতেছে,—

"বদনমণ্ডল মাঝে অক্ষিরূপ তূণ।
লুকাইয়া পুষ্পশর রেখেছে অর্জ্জুন ॥
ধনুকের গুণ খুলি রেখেছে মনেতে।
ধনুঃ মাত্র থুইয়াছে কপাল নিম্নেতে ॥
প্রণয়কাননে পার্থ থাকে লুকাইয়া।
মৃগী অন্বেষণ করে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া ॥
কুরঙ্গিনী কামিনীর পাইলে সন্ধান।
কটাক্ষে টানিয়া ধনুঃ করয়ে সন্ধান ॥
* * * *
মনের অনলে সখি, প্রাণ মোর দহে।
ভস্মসাৎ হই বুঝি আর নাহি সহে ॥
জ্বলিছে প্রবলতর বাণের আগুন।
জলধররূপ হেরি সম্মুখে অর্জ্জুন ॥

হতাশা পবন তায় হয়ে সহকারী।
ঘন হতে নাহি বর্ষাইতে দেয় বারি॥
অনলে অনিলে প্রেম অতি ঘোরতর।
উভয়ের সংযোগে উভয়ে বীরবর॥
এখনো অর্জ্জুন যদি বরিষে সলিল।
তবে থামাইতে পারে অনল অনিল॥"

[৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ সংযোগস্থল।]

আবার আর একস্থানে সুভদ্রা পাঁচালীর ছড়ার ন্যায় শ্লেষালঙ্কার-যুক্ত বিলাপ করিতেছে—

"কালকূট দেও সখি করি আমি পান।
নিশাকর সহিত প্রাণ হউক অবসান॥
কাল সম কাল রাত্রি মম পক্ষে কাল।
চাহি কাল নাহি ইচ্ছা দেখিতে সকাল॥
জ্ঞানে নাহি পাপ ক্রিয়া করি কোনও কাল।
দাদা বলদেব কেন হইলেন কাল।"

এইরূপ কৃত্রিমতাপূর্ণ রচনার পরাকাষ্ঠা অন্ত্যযমকবহুল নিম্নোদ্ধৃত অর্জ্জুনের রূপবর্ণনায় সুপ্রকট,—

"অর্জ্জুনের মুখ-সুধাকর সুধাকর।
যেই সুধাপানে হইল অমর অমর॥
সেই সুধা মম প্রাণী যদি পান পান।
তা নহিলে কভু নাহি পাবে প্রাণ প্রাণ॥
তাহার হৃদয় জলাশয় জলাশয়।
এ হৃদি-মরাল-পক্ষে সেই পয় পয়॥
মম হৃদে লগ্ন তার যদি পাই পাই।
এ নয়ন উন্মীলনে তবে চাই চাই॥
নহিলে না থাকে স্নিগ্ধ জলন জলন।
কেমনে করিবে গৃহে চরণ চরণ॥"

[৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ সংযোগস্থল।]

আবার ইহার উপর অপ্রচলিত দুরূহ উৎকট শব্দ-বিন্যাসে নাট্যকার নাটকখানির শোভাসম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, যথা—

"মন-কুঞ্জর মম নাহি ধৈর্য্য ধরে।
পাপ-খঞ্জরাঘাত কত সহ্য করে॥
ভূতে নিস্তার করণাশে পঙ্ককূপে।
ভূতা জঞ্জাল ক্ষিতিতলে বঙ্করূপে॥"

[১ম অঙ্ক, ১ম সংযোগস্থল।]

আর অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, নাটকের মধ্যে স্থানে অস্থানে কাব্যরস অবতারণার চেষ্টা করাতে 'ভদ্রার্জ্জুন' কিরূপ নীরস, বিরক্তিজনক ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধুর নাটকাবলীর মধ্যে কাব্যরস-যুক্ত দীর্ঘ কবিতাগুলিও অভিনয়ের সময় বিশেষ বিরক্তিজনক মনে হইয়া থাকে। কাব্যরচয়িতা যে পথে চলেন, নাট্যকারের সে পথ নহে। ভারতচন্দ্র অনুপ্রাস যমক প্রয়োগ করিয়া উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি দিয়া শত পংক্তিতে বিদ্যার রূপবর্ণনা করিতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার পাত্রপাত্রীর মুখে এতাদৃশ বর্ণনা দিলে নিঃসন্দেহ হাস্যাস্পদ হইবেন। সংস্কৃত নাটকাদিতে কেবল কাব্যাংশবহুল এক একটি সমগ্র অঙ্ক * দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি অভিনয়কাল অপেক্ষা পাঠকালেই সমধিক প্রীতিদায়ক। রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে নিজ নাটকাবলীর স্থানে স্থানে এ দোষ সংক্রামিত করিয়াছেন। তাঁহার পথে পরে দীনবন্ধুও অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের আলোচ্য 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকখানিতেও পূর্ববর্ত্তী বাঙ্গলা কাব্যের কৃত্রিমতাপূর্ণ রচনার প্রভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

"ভদ্রার্জ্জুনে"র প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পদ্যে রচিত। পয়ার ও

---

* উত্তররামচরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক। বিক্রমোর্ব্বশী, চতুর্থ অঙ্ক ইত্যাদি।

ত্রিপদী ছন্দই নাটকখানিতে সমধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। কথোপকথন পদ্যেই চলিতেছে। যথা—

অর্জ্জুন। কে তুমি এখানে কর আক্ষেপ প্রকাশ ?
ব্রাহ্মণ। দেখ হে অর্জ্জুন মম হয় সর্ব্বনাশ।••
অ। বিশেষ করিয়া তার কহ বিবরণ।
ব্রা। ধর্ম্মরাজ্যে অরাজক হয় কি কারণ॥
অ। কেন প্রভো কি ঘটনা হইয়াছে কও।
ব্রা। আমার গোধনগণ আনাইয়া দাও।

[১ম অঙ্ক, ২য় সংযোগস্থল।]

হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার একটি মৌলিক দৃশ্য সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার হাস্যরসের নমুনা এইরূপ,—

"[এক বাতুল, এক মদ্যপায়ী ও কতিপয় পথিক প্রবেশ করিল। মদ্যপায়ী গান করিতেছে।—

* * * * *

বা। বেটা তুই কি গান করিতেছিস্?
ম। ওরে শ্যালা, মার নাম গাইতেছি।
বা। তুই শ্যালা, মদ খাইয়াছিস্? উঁ, শ্যালার মুখে গন্ধ দেখ।••
ম। (গীত) ঐ আসতেছে অর্জ্জুন।
আমি মদের জন্য হব খুন।
যখন অর্জ্জুন আসবে কাছে তার কাছে ভিক্ষা চাব।
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে তাই দিয়ে মদ কিনে খাব। ••
ম। ও ভাইসকল, ঐ দেখ কৃষ্ণের রথ আসিতেছে। আমাদের এক কৃষ্ণ ছিলেন, আবার দুইটা হইয়াছেন। একি! তবে অর্জ্জুন কোথায়? •• হয় ত অর্জ্জুন পলাইয়াছে।
বা। হাঁ, তোর ভয়ে।••
তৃতীয় পথিক। ওহে, অর্জ্জুন ত কেহই নয়, একজন কৃষ্ণ ও অন্যজন উদ্ধব। ••

চতুর্থ পথিক। কেন উদ্ধব উদ্ধব করিতেছ, উদ্ধবকে কোথায় পাইলে? উদ্ধব, উদ্ধব, একটা কি কথা পাইয়াছ, উদ্ধব কাহাকে দেখিলে?
অন্যান্য পথিক। অর্জ্জুনই বটে। হাঁ, তিনিই বটে। কোথা উদ্ধব, যে বলে সে গর্দ্দভ।"

[৩য় অঙ্ক, ৫ম সংযোগস্থল।]

ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে নাট্যকারের হাস্যরস-সৃষ্টি-প্রয়াস বিশেষ সফল হয় নাই। তবে প্রথম যে সকল বাঙ্গলা নাটক রচিত হইয়াছিল, তাহার রচয়িতাগণ প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থকারের ন্যায় অশ্লীলতার অবতারণা করিয়া নাটকে হাস্যরস আনিতেন। 'ভদ্রার্জ্জুন'-প্রণেতা যে তাহা করেন নাই, এইমাত্র প্রশংসা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"ভদ্রার্জ্জুনে" এক বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটি দৃশ্যের শেষে কতকগুলি পংক্তিতে অনেক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। যথা, প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের পর লেখা আছে—

"এইরূপ বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে আশীরাশি প্রদানকরত স্বগৃহে গমন করিলেন।"

[১৫ পৃষ্ঠা]

মুদ্রিত নাটক পাঠের সময় না হয় আমরা ব্যাপারটা বুঝিলাম, কিন্তু অভিনয়ের সময় দর্শক ইহা বুঝিবে কিরূপে? হয় ইহা উহ্য থাকিবে, না হয় নাট্যকারকে কোনও স্বগতোক্তি বা অন্য পাত্রের উক্তি দ্বারা ইহা বুঝাইতে হইবে।

"ভদ্রার্জ্জুন" বাঙ্গালার আদি নাটক হইলেও ইহার কোথাও অভিনয় হয় নাই। সেইজন্য সাধারণের নিকট ইহা তত প্রতিপত্তি বা প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ইহার একমাত্র বিশেষত্ব এই যে, ইহা ইংরাজী নাটকের গঠন-রীতির আদর্শে রচিত, সংস্কৃত নাটক-রচনা-পদ্ধতির আদৌ অনুসরণ করে নাই। বাঙ্গলা নাটকের বাহ্য-গঠনে

ইংরাজী আদর্শই এখন স্থায়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু 'ভদ্রার্জ্জুনে'র প্রভাবে তাহা হয় নাই। মাইকেল ও দীনবন্ধুর নাটকাবলীর প্রভাবেই তাহা হইয়াছে। তবে ইংরাজী নাটকের গঠন-রীতির অনুকরণ-প্রয়াস 'ভদ্রার্জ্জুনে'ই প্রথম হইয়াছিল। কেবল ইহার অভিনয় না হওয়ায় এ নাটকখানি জনসাধারণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

"ভদ্রার্জ্জুনে"র সমসাময়িক দুইখানি নাটকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহাদের একখানিকে 'ভদ্রার্জ্জুনে'রও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে চাহেন।* যতদিন না উক্তগ্রন্থ কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে ততদিন নিশ্চয় করিয়া ইহা স্বীকার করা যায় না। তবে অন্যান্যস্থল হইতে এইমাত্র জানা যায় যে হরচন্দ্র ঘোষ এই নাটক দু'খানির প্রণেতা। ইনি হুগলীনিবাসী ছিলেন। ইংরাজী হইতে বাঙ্গলায় গ্রন্থাদি অনুবাদে ইঁহার পটুতা ছিল। হুগলীকলেজে পাঠ্যাবস্থায় ইঁনি Baconএর Essay on Truthএর বঙ্গানুবাদ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাটক দু'খানিও অনুবাদ মাত্র। প্রথম "ভানুমতী-চিত্তবিলাস" Merchant of Veniceএর অনুবাদ ও দ্বিতীয় "চারুমুখ-চিত্তহরা" Romeo Julietএর অনুবাদ। এই বাঙ্গলা নাটক দু'খানির ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই সেক্ষপীয়রের ন্যায়। পাত্রপাত্রীর নামগুলি কেবল বাঙ্গলা। সুতরাং বাঙ্গলা মৌলিক নাটক বলিতে গেলে "ভদ্রার্জ্জুন"ই আদি নাটক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউস্ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বাঙ্গলা ভাষার প্রথম নাটককার কে?" এই প্রশ্নের আলোচনা হয়। কে, বি, দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, One who knows প্রভৃতি মহোদয়গণ পত্রদ্বারা এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা পান। শেষোক্ত অজ্ঞাতনামা পত্রপ্রেরক হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী-চিত্তবিলাস"কে "ভদ্রার্জ্জুনে"র পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন। আমরা এই নাটকখানির অনুসন্ধান করিতে সকলকে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[৪]

তত্ত্ব ও কল্পনা

পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্ববস্তু যে কৃষ্ণবস্তু তাহা হইতে পৃথক্ করিতে গেলে, লোকের গতানুগতিক ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে, ইহা জানি। এই দুই যে ফলতঃ একই বস্তু, ইহাদেরে যে একান্তভাবে পৃথক্ করিতে পারা যায় না, ইহাও মানি। কিন্তু লোকে তত্ত্বের খোঁজ রাখে না বলিয়াই যে পৌরাণিকী কল্পনার নিগূঢ় মর্ম্মও বুঝে না, এই কথাই বা অস্বীকার করিতে পারি কি? শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণলোকে একজন দেবতা মাত্র মনে করিয়া থাকে। আর দেবতাতে ব্রহ্মজ্ঞান এদেশে নূতন নহে। প্রাচীনকাল হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবোপাসকেরা আপন আপন সাম্প্রদায়িক উপাস্যবস্তুকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাও এইরূপে ব্রহ্মপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"—ঋগ্বেদের এই সর্ব্বজনবিদিত শ্রুতি ইহার প্রমাণ। পৌরাণিক ধর্ম্মেও বিষ্ণু এবং মহেশ্বর উভয়ই ব্রহ্মরূপে উপাসিত হইয়াছেন। তন্ত্রের কালী দুর্গা প্রভৃতি সকলেই সাধারণ তান্ত্রিকদিগের দ্বারা "ব্রহ্মময়ী"রূপে আরাধিত হইয়া আসিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধকেরা কালী এবং কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত মিলাইয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ স্বয়ং ইহার সাক্ষী। "গোপনে, গোকুলে এসে, শ্যাম সেজেছ, শ্যামা!" "একবার নাচ গো শ্যামা, যশোদা নাচাত তোমায়, বলে নীলমণি, সে বেশ লুকালে কোথায়, করালবদনী";—এইসকল সংগীত ইহার প্রমাণ। এইসকল ক্ষেত্রে আন্তরিক অনুভূতি যতই গভীর এবং ভাবোচ্ছ্বাস যতই আকুল হউক না কেন, তত্ত্বের উপলব্ধি যে ততটা পরিষ্কার নহে, একথা অস্বীকার করা

অসম্ভব। বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বলিয়াছেন। ইনি ঋষিকেশ। ইনি নারায়ণ। ইনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, বৃন্দাবনচন্দ্র। দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়া বৃন্দাবনে লীলা, মথুরায় অসুরনাশ, দ্বারকায় রাজত্ব, কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন; পুরাণের সকল কথাই বৈষ্ণবেরা সমভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু অতি অল্প লোকেই পূর্ব্বাপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া, তত্ত্বের সঙ্গে পুরাণের সম্যক সমন্বয় সাধন করিয়া, এই বিরাট ও জটিল কৃষ্ণকথার নিগূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যথাসাধ্য বিচারপূর্ব্বক এসকলের একটা অর্থবোধের চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বৈষ্ণবেরা কোনও বিচারই করেন না। "বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর"—এই সত্য উপদেশের একটা কল্পিত কদর্থ করিয়া, "পহুঁ তুহিঁ সে কেবলে"র-স্থানে "বপু ভূতিসে কেবল" পড়িয়া, চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া, তৃপ্তিলাভ করেন। কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান ইহাঁরা রাখেন না। কৃষ্ণজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত ইহাঁদের জাগে নাই। আর তত্ত্বভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন না বলিয়া, বহুতর নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কৃষ্ণোপাসনাও কেবল কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপে এবং বস্তুতন্ত্রতাবিহীন ভাবের উচ্ছ্বাসেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাঁরা নাম শুনিয়াছেন, বস্তু চিনেন নাই, চিনিবার আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়াছে কি না, সন্দেহ। ইহাঁরা অনুবাদকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, যার অনুবাদ তার খবর জানেন না ও রাখেন না। কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু সত্য দেখেন নাই। আর কৃষ্ণবস্তু যে সত্যবস্তু ও তত্ত্ববস্তু, এই কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্যই, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া একটা নূতন কথার সৃষ্টি করিয়া, এই শ্রীকৃষ্ণকে পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ হইতে এতটা জোর করিয়া টানিয়া পৃথক্ করিতে হয়। নতুবা, প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণতত্ত্বকে কৃষ্ণকথা হইতে পৃথক্ করা যায় না। শুক্ল বা কৃষ্ণ বস্তু হইতে যেমন শুক্লত্ব বা কৃষ্ণত্ব ধর্ম্মকে, চিন্তায় পৃথক্ করিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে পৃথক্ করা যায় না; সেইরূপই কৃষ্ণতত্ত্বকে কৃষ্ণকথা হইতে পৃথক্ করা সাধ্যায়ত্ত নহে।

শুক্লবস্তু ও শুক্লত্ব, কৃষ্ণবস্তু ও কৃষ্ণত্ব, তিক্তবস্তু ও তিক্তত্ব, সাধু ব্যক্তি ও সাধুতা, ধার্ম্মিক ও ধর্ম্ম, ভক্ত ও ভক্তি, এ সকল যেমন অভিন্ন; কৃষ্ণকাহিনী এবং কৃষ্ণতত্ত্বও সেইরূপই অভিন্ন। ধর্ম্ম ভিন্ন ধার্ম্মিক অসৎ। ভক্তি ভিন্ন ভক্ত অলীক কল্পনা মাত্র। আবার ধার্ম্মিক এবং ভক্ত ভিন্ন ধর্ম্ম এবং ভক্তিও নিরাকার ভাব মাত্র, সত্য বস্তু নহে। ধর্ম্মের ও ভক্তির বাস্তবতা ধার্ম্মিকে ও ভক্তে। ধার্ম্মিকের ও ভক্তের সত্তা ও প্রতিষ্ঠা ধর্ম্মেতে ও ভক্তিতে। সেইরূপ তত্ত্ব ভিন্ন পুরাণ অবস্তু, মিথ্যা। পুরাণ ভিন্ন তত্ত্ব অব্যক্ত, অজ্ঞাত। কৃষ্ণতত্ত্বের আশ্রয়েই পুরাণের অপূর্ব্ব কৃষ্ণকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার এই কাহিনীর মধ্যেই ঐ তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুরাণ-কথাকে অবলম্বন করিয়াই, যুগযুগান্ত ধরিয়া, আমাদের দেশের সুকৃতি-সম্পন্ন সাধকেরা, নিজেদের অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই কৃষ্ণ-বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ভাব ও ভাষার পরস্পরের সঙ্গে যে নিগূঢ়, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-তত্ত্বের সঙ্গেও পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীর সেই সম্বন্ধ। কৃষ্ণতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য, ভাব-স্বরূপ। সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুই পুরাণের কৃষ্ণকথার মধ্য দিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্কষক অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাব অগ্রজ, ভাষা তার অনুজ। কোনও কোনও পণ্ডিত-গণ বলেন যে ভাব ও ভাষা একে অন্যের অগ্রজ বা অনুজ নহে, দু'ই যমজ; যুগপৎ উভয়ের উদ্ভব হয়। মানুষের চিন্তার প্রণালী-তেই কেবল ভাবকে ভাষার অগ্রজ বলা হয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে ভাষাকে মুখে করিয়াই ভাব প্রকাশিত হয়। কিন্তু আদিতে ভাব যদিও বা ভাষার পূর্ব্বজ হয়; তথাপি এই ভাষার দ্বারাই পরে ঐ ভাবের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। ভাষা যত ফোটে, ভাব তত বাড়ে। ভাব যত ফোটে, ভাষাও তত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু ভাষা যতই পরিস্ফুট হউক না কেন, ভাব সর্ব্বদাই তাহাকে ছাড়াইয়া থাকে; কিন্তু কখনও ছাড়িয়া যায় না।

ভাব নিরাকার, ভাষা তাহাকে আকারিত করে। ভাব মূক, ভাষা তাহাকে মুখর করে। ভাব ধোঁয়া, ভাষার সুনিপুণ ফুৎকারেই তাহা জ্বলিতজ্বলনরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠে। ভাব বিশ্ববীজ স্ফোট-স্বরূপ। ভাষা সেই স্ফোটেরই পরিণতি, এই প্রত্যক্ষ রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় সৃষ্টি। ভাব ও ভাষার মধ্যে এই যে নিগূঢ়, নিত্য, ব্যক্তাব্যক্ত, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখিতে পাই, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পৌরাণিকী কল্পনার শ্রীকৃষ্ণেরও সেই সম্বন্ধ। পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ কল্পিত বটেন, কিন্তু অসত্য নহেন।

ফলতঃ কল্পনা সর্ব্বথাই যে মিথ্যা হয়, এই কথাই বা কে বলিল? অলীক কল্পনা আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কল্পনা যে নাই, ইহাই বা বলি কেমনে? আমাদের ভাষাতে অলীক কল্পনার একটা বিশিষ্ট নাম নাই। কেহ কেহ ইহাকে কাল্পনিকতা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অলীকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতার ভাবই বেশী প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই এই কথারও তেমন ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু ইংরাজিতে ইহার একটা বিশিষ্ট নাম আছে। ইংরাজিতে অলীক কল্পনাকে ফ্যান্সি কহে। সত্য-কল্পনারও একটা নাম সে ভাষায় আছে, তাহাকে ইমেজিনেষণ বলে। ফ্যান্সি এবং ইমেজিনেষণ দু'ই আমরা কল্পনা বলিয়া থাকি; কিন্তু ইংরাজি ফ্যান্সি আর ইমেজিনেষণ এক বস্তু নহে। আর কল্পনার আশ্রয়ে যে কেবল কাব্যসৃষ্টিই হয়, তাহাও ত নয়। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, তত্ত্ববিদ্যা, মানবজীবনের কোনও শ্রেষ্ঠ সাধনা বা সম্ভোগই কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষবাদীগণ যতই বাস্তবতার বড়াই করুন না কেন, তাঁহাদের এই তথাকথিত প্রত্যক্ষবাদ পর্য্যন্ত কল্পনার সাহায্য ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না। জড়বিজ্ঞান যে বিশ্বব্যাপী বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া, বিশ্বেশ্বরকে পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিতে চাহে, সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা তথ্যও কল্পনারই উপরে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের উপরে নহে। আধুনিক কেমিতি যে পরমাণুবাদের বা অ্যাটমিক থিওরীর উপরে সমগ্র রসায়ন

তত্ত্বটাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পরমাণু কেহ কি কখনও দেখিয়াছে, না মাপিয়াছে, না কোনও উপায়ে তার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছে? এই পরমাণুবাদও ত কল্পিত, প্রত্যক্ষ নহে। যে মাধ্যাকর্ষণী শক্তির দ্বারা অসংখ্য সৌরজগৎ আপনাপন সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি লইয়া এই মহাশূন্যে ঝুলিতেছে ও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্টপথে চলিতেছে, তাহা কি প্রত্যক্ষ, না কল্পিত? বৃন্তচ্যুত ফল মাটিতে পড়িয়া যায়, আকাশে ঝুলিয়া থাকে না; এটা একটা অদ্ভুত বা অদৃষ্টপূর্ণ ঘটনা নহে। কিন্তু এই ঘটনা দেখিয়া নিউটন যে বিশ্বব্যাপী মাধ্যাকর্ষণী শক্তির প্রচার করিলেন, তাহা কোনও দিন কেউ চক্ষে দেখে নাই, হাতে ধরে নাই, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করে নাই। এই যে মাধ্যাকর্ষণের বিধান আবিষ্কৃত হইল, ইহা কি প্রত্যক্ষের, না কল্পনার ফল? বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ করেন বিশিষ্ট ঘটনা বা কার্য্য, কিন্তু কল্পনা করেন তাহার অন্তরালে বিশাল, বিশ্বজনীন কারণের বা নিয়মের বা শক্তির খেলা। বিজ্ঞান যত কেন প্রত্যক্ষের দোহাই দিক না, কল্পনাকে ছাড়িয়া সে এক চুলও আপনার সাধনপথে চলিতে পারে না। গণিতবিদ্যাকে ত সকলেই নিতান্ত প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু গণিত পর্য্যন্ত এই সত্য কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া আছে। দেশ এবং কালের উপরেই গণিতের প্রতিষ্ঠা। অনন্ত বিস্তৃত দেশ, যে দেশ আবার অনন্তভাগে বিভক্ত হইতে পারে; অনন্ত প্রবাহিত কাল, যে কাল আবার অনন্তভাগে বিভক্ত হইতে পারে;—এই দুইটি বস্তুকে লইয়াই ত গণিতের যত কারচুপি। কিন্তু এই অনন্ত-বিস্তার ও অনন্ত-প্রবাহ, অথচ অনন্ত বিভাগক্ষম দেশ ও কাল কে কোথায়, কিরূপে, কোন্ দিন, প্রত্যক্ষ করিয়াছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশখণ্ডই আমরা জানি। ছোট ছোট কাল-কলাই আমরা বুঝি। এদের সীমা দিতে পারি না। সীমা দিতে যাইয়াই দেখি, পূর্ব্বে ও পরে আরও দেশ এবং আরও কাল থাকিয়া যায়। এই পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ গোচর হয়। কিন্তু যার

লাগাইল পাই নাই, তাহাই যে অনন্ত, কোনও দিন তার অন্ত পাইব না, এ কথা বলি কার জোরে? এ ত কল্পনা। যাহা প্রত্যক্ষ করি, তারই ইঙ্গিত লইয়া এই সকল কল্পনার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়, এই কথা সত্য। ইহা কল্পনা বটে, কিন্তু এই কল্পনা বস্তু-তন্ত্র, প্রত্যক্ষের উপরে, প্রত্যক্ষকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়াই, গড়িয়া উঠিয়াছে, এই কথা বলিতে পার। আর তারই জন্য বিজ্ঞানের এ সকল কল্পনা সত্য, এই দাবি করাও সম্ভব। এই কল্পনাকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আস্তিক নাস্তিক সকল প্রমাণশাস্ত্রেই অনুমান ও উপমানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আর অনুমানের রাজ্যে যাইতে হইলেই, কল্পনার রথে চড়িতে হয়। এই কল্পনাকে ছাড়িয়া কেবল যে কাব্যসৃষ্টিই অসম্ভব হয়, তাহা নহে। ইহাকে ছাড়িয়া মানুষের মন কিছুই মনন করিতে পারে না; মানুষের জ্ঞান কিছুই জানিতে পারে না; মানুষের চেষ্টা পঙ্গু হইয়া পড়িয়া রহে; মানুষ এই সকল সুখসাধক ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া, এই আনন্দময় বিশ্বে, কণা-মাত্র আনন্দভোগ করিতে পারে না। কল্পনা মাত্রকেই যদি অসত্য বলিয়া পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে কেবল কৃষ্ণগাথা নহে, কিন্তু—

'সীমার মধ্যে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর'

এসকল নিরাকার সংগীতকেও কল্পিত বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। নানকের যে অমন গুরুগম্ভীর ভজন,

"গগনমে থালে রবিচন্দ্র দীপক জলে",

তাহাকেও মিথ্যা বলিয়া ছাড়িতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম্মের সকল বাঁধন, ভক্তির সকল সাধন, জীবনের সকল প্রতিষ্ঠাই উড়িয়া যায়। অথচ এই সকলকে উড়াইয়া দিয়াও, কল্পনাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পুরাতন লোকায়ত ও আধুনিক জড়বাদী নাস্তি-কেরা এসকলের কিছুই ত একরূপ মানেন নাই, অথচ এই প্রত্যক্ষ সংসার-ভোগের জন্যই ইহাঁদিগকেও পদে পদে কল্পনার পদসেবা

করিতে হয়। ফলতঃ কল্পিত আর মিথ্যা একই কথা নহে। মিথ্যা কল্পনা বিস্তর আছে। কিন্তু সত্য কল্পনাও আছে। মানুষের প্রত্যক্ষ ও প্রামাণ্য অভিজ্ঞতাকে ধরিয়া, সেই অভিজ্ঞতার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন বা অর্থ প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, যে কল্পনা ফুটিয়া উঠে, তাহাই সত্য কল্পনা। ইহাকেই ইংরাজিতে ইমেজিনেষণ কহে। এই কল্পনা সত্য বলিয়াই, বিজ্ঞানের রাজ্যে ইহাকে সায়াণ্টিফিক্ ইমেজিনেষণ—scientific imagination—বা বৈজ্ঞানিক কল্পনা; ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে, হিষ্টরিক্ ইমেজিনেষণ—historic imagination—বা ঐতিহাসিক কল্পনা; ধর্ম্মজীবনে রিলিজিয়াস্ ইমেজিনেষণ—religious imagination—বা ধর্ম্ম-কল্পনা; এবং কাব্য-সৃষ্টিতে পোয়েটিক ইমেজিনেষণ—poetic imagination—বা কবিকল্পনা বলিয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে ফ্যান্সি—fancy—শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কারণ এইসকল কল্পনা হইলেও মিথ্যা নহে। এ কল্পনা প্রত্যক্ষেরই মতন, এমন কি এক হিসাবে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা বেশী সত্য। প্রত্যক্ষ যাহার ইঙ্গিত মাত্র করে, আপনার সত্য প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠারূপে যে বস্তুর সঙ্কেত মাত্র প্রত্যক্ষ বহন করিয়া আনে, কিন্তু যাহাকে প্রত্যক্ষের দ্বারা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, এই কল্পনা, সেই সঙ্কেত ধরিয়া, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেরই ভিতরে যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সত্য বা তত্ত্ব লুকাইয়া আছে, তাহাকে প্রকা-শিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। এই জন্য এই কল্পনা যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তাহা অতীন্দ্রিয় মাত্র, অসত্য নহে। অতএব পৌরাণিকী কৃষ্ণ-কাহিনী কল্পিত বলিয়া যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, এমন বলা যায় না। সত্য কল্পনাতেও সত্যাভাস মিশিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক কল্পনা—সায়েণ্টিফিক্ ইমেজিনেষণ—এবং ঐতিহাসিক কল্পনা বা হিষ্টরিক্ ইমেজিনেষণেও থাকে; সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ়তম যে ধর্ম্মরাজ্য, সে রাজ্যের সত্য-কল্পনায় অর্থাৎ রিলিজিয়াস্ ইমেজিনেষণেতে যে বহুতর সত্যাভাস থাকিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। পৌরাণিকী কল্পনার কৃষ্ণকাহিনীতে যে সত্যাভাস নাই, এমন কথা কে বলিবে? আর এই কল্পনার কতটাই

বা সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র, আর কতটাই বা অলীক ও বস্তুতন্ত্রতা-বিহীন এবং সত্যাভাস মাত্র, কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনার দ্বারাই কেবল তাহা ধরিতে পারা যাইবে। ইহার আর কোনও কষ্টিপাথর নাই। আর এই কারণেই, তত্ত্ববস্তুকে দৃঢ় করিয়া ধরিবার জন্যই, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণকে এই বিচারের সূচনায়, ব্যতিরেকী পন্থার অনুসরণ করিয়া, পুরাণ-কল্পনার শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ করিতে হয়। পরিণামে অন্বয়মুখে, পৌরাণিকী কথার যতটা তত্ত্বের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে ও তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আপনি নিজের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়া সত্য-বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সাগর সঙ্গ

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ প্র

সচিত্র কাব্য গ্রন্থ। রাজ সংস্করণ—মূল্য

পুষ্প হার

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী প্রণীত।

ইহাতে সাতটি সুন্দর সচিত্র গল্প আছে।

মূল্য মাঘোৎসব উপলক্ষে এক মাস

কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা। কাগজের মলাট ৸৹ আনা।

১। উত্তর রাম চরিত
২। মালবিকাগ্নি মিত্র

শ্রীমতী বিমলা দাসগুপ্তা প্রণীত

এই দুইখানি মূল সংস্কৃত হইতে সরল সুললিত বঙ্গানুবাদ।

সেণ্ট্রাল্ টেক্সট্ বুক কমিটি হইতে "উত্তর রাম চরিত"

পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

মূল্য,—

উত্তর রাম চরিত (কাগজের মলাট) ৸৹ আনা।

মালবিকাগ্নি মিত্র (কাপড়ে বাঁধাই) ৸৹ আনা।

ভিখারিণী

শ্রীমতী অমলা দেবী প্রণীত।

গ্রাণ্ড ন্যাশন্যাল থিয়েটারে বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

মূল্য—৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—"নারায়ণ" কার্য্যালয়,

গুরুদাস লাইব্রেরী, অন্নদা বুক্‌ষ্টল্ ও অন্যান্য পুস্তকালয়।